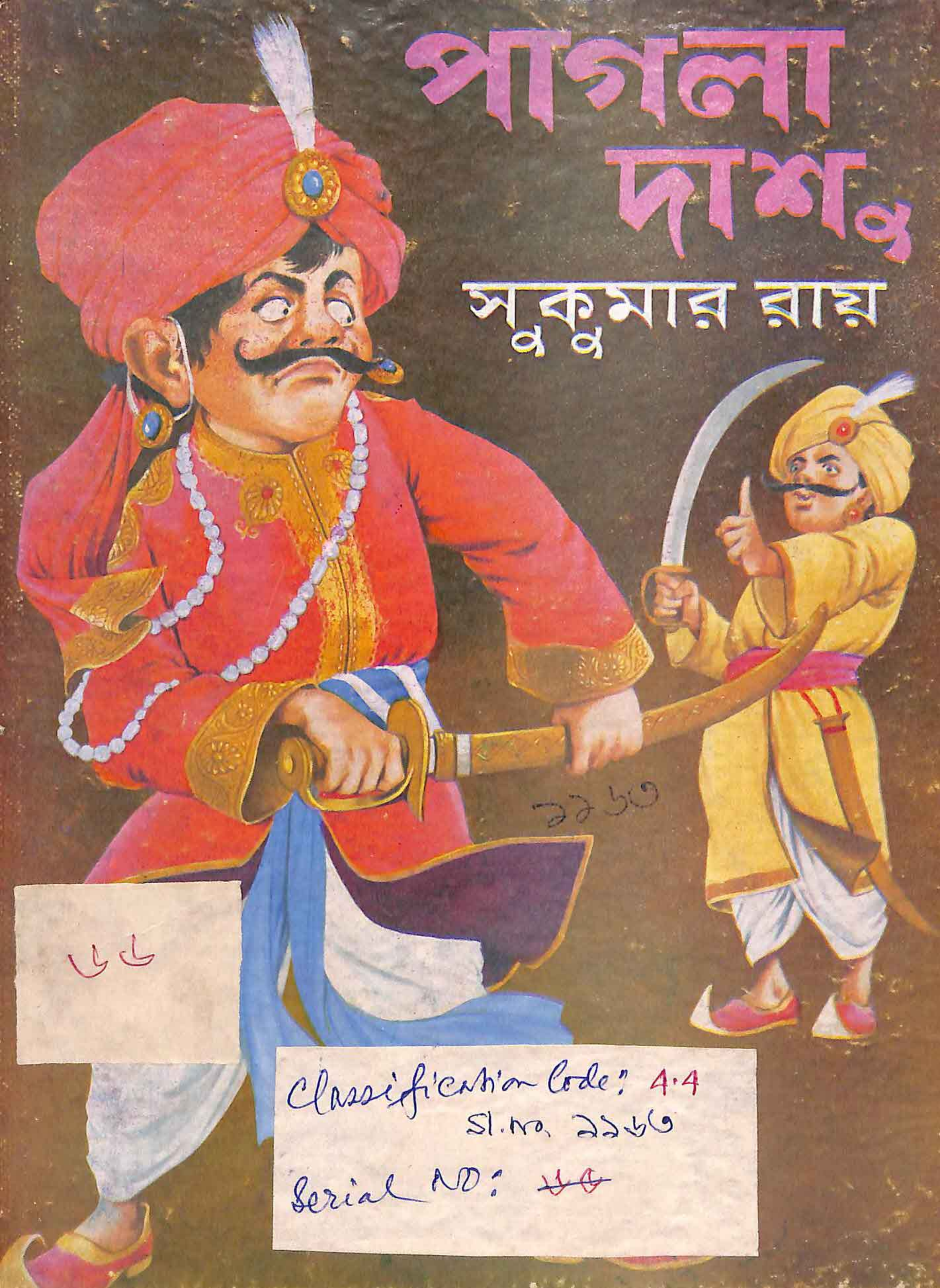
পাগলা দাশু

সুকুমার রায়



পাগলা দাশু



সুকুমার রায়

পাগলা দাশু



সুকুমার রায়

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১ এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩



সব গল্প আছে

মূল্য আট

পাগলা দাশু

আমাদের স্কুলের যত ছাত্র তাহাদের মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে পাগলা দাশুকে না চিনে। যে লোক আর কাহাকেও জানে না, সেও সকলের আগে পাগলা দাশুকে চিনিয়া ফেলে। সেবার এক নতুন দরোয়ান আসিল, একেবারে আন্‌কোরা পাড়াগেঁয়ে লোক, কিন্তু প্রথম যখন সে পাগলা দাশুর নাম শুনিল, তখনই সে আন্দাজে ঠিক করিয়া লইল যে, এই ব্যক্তিই পাগলা দাশু। কারণ মুখের চেহারায়, কথা-বার্তায়, চাল-চলনে, বোঝা যাইত যে তাহার মাথায় একটু 'ছিট' আছে। তাহার চোখ দুটি গোল গোল, কান দুটি অনাবশ্যক রকমের বড়, মাথায় এক বস্তা ঝাঁক্‌ড়া চুল। চেহারাটা দেখিলেই মনে হয়—

ক্ষীণদেহ খর্বকায় মুণ্ড তাহে ভারি
যশোরের কই যেন নরমূর্তিধারি।

সে যখন তাড়াতাড়ি চলে অথবা ব্যস্ত হইয়া কথা বলে, তখন তাহার হাত-পা ছোঁড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হঠাৎ কেন জানি চিংড়িমাছের কথা মনে পড়ে।

সে যে বোকা ছিল তাহা নয়। অঙ্ক কষিবার সময়, বিশেষত লম্বা-লম্বা গুণ-ভাগের বেলায় তাহার আশ্চর্য মাথা খুলিত। আবার এক-এক সময় সে আমাদের বোকা বানাইয়া তামাশা দেখিবার জন্য এমন সকল ফন্দি বাহির করিত যে, আমরা তাহার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতাম।

'দাশু' অর্থাৎ দাশরথি, যখন প্রথম আমাদের স্কুলে ভরতি হয়, তখন জগবন্ধুকে আমাদের 'ক্লাশের ভালো ছেলে' বলিয়া সকলে জানিত। সে পড়াশুনায় ভালো হইলেও, তাহার মতো অমন একটি হিংসুটে ভিজেবেড়াল আমরা আর দেখি নাই। দাশু একদিন জগবন্ধুর কাছে কি একটা ইংরাজি কথার মানে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল। জগবন্ধু তাহাকে খামখা দুকথা শুনাইয়া বলিল, 'আমার বুঝি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? আজ এঁকে ইংরিজি বোঝাব, কাল ওঁর অঙ্ক কষে দেব, পরশু আর একজন আসবেন আর এক ফরমাইস নিয়ে—ঐ করি আর কি!' দাশু সাংঘাতিক চটিয়া বলিল, 'তুমি তো ভারি ছ্যাঁচড়া ছোটলোক!' জগবন্ধু পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে নালিশ করিল, 'ঐ নতুন ছেলেটা আমায় গালাগালি দিচ্ছে।' পণ্ডিত মহাশয় দাশুকে এমনি ধমক দিয়া দিলেন যে বেচারা একেবারে দমিয়া গেল।

আমাদের ইংরাজি পড়াইতেন বিষ্টুবাবু। জগবন্ধু তাঁহার প্রিয় ছাত্র। পড়াইতে পড়াইতে

যখনই তাঁহার বই দরকার হয়, তিনি জগবন্ধুর কাছেই বই চাহিয়া লন। একদিন তিনি পড়াইবার সময় 'গ্রামার' চাহিলেন, জগবন্ধু তাড়াতাড়ি তাহার সবুজ কাপড়ের মলাট দেওয়া 'গ্রামার'খানা বাহির করিয়া দিল। মাস্টার মহাশয় বইখানা খুলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বইখানা কার?' জগবন্ধু বুক ফুলাইয়া বলিল, 'আমার।' মাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'হুঁ—নতুন সংস্করণ বুঝি? বইকে-বই একেবারে বদলে গেছে।' এই বলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন—'যশোবন্ত দারোগা—লোমহর্ষক ডিটেকটিভ নাটক।' জগবন্ধু ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মতো তাকাইয়া রহিল। মাস্টার মহাশয় বিকট রকম চোখ পাকাইয়া বলিলেন, 'এই সব জ্যাঠামি বিদ্যে শিখচ বুঝি?' জগবন্ধু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু মাস্টার মহাশয় এক ধমক দিয়া বলিলেন, 'থাক্ থাক্ আর ভালোমানুষি দেখিয়ে কাজ নেই—ঢের হয়েছে।' লজ্জায় অপমানে জগবন্ধুর দুই কান লাল হইয়া উঠিল—আমরা সকলেই তাহাতে বেশ খুশি হইলাম। পরে জানা গেল যে এটি দাশুভায়ার কীর্তি, সে মজা দেখিবার জন্য উপক্রমণিকার জায়গায় ঠিক ঐরূপ মলাট দেওয়া একখানা বই রাখিয়া দিয়াছিল।

দাশুকে লইয়া আমরা সর্বদাই ঠাট্টাতামাশা করিতাম এবং তাহার সামনেই তাহার বুদ্ধি ও চেহারা সম্বন্ধে অপ্রীতিকর সমালোচনা করিতাম। তাহাতে একদিনও তাহাকে বিরক্ত হইতে দেখি নাই। এক এক সময়ে সে নিজেই আমাদের মন্তব্যের উপর রঙ চড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প বলিত। একদিন সে বলিল, 'ভাই, আমাদের পাড়ায় যখনই কেউ আমসত্ত্ব বানায় তখনই আমার ডাক পড়ে। কেন জানিস?' আমরা বলিলাম, 'খুব আমসত্ত্ব খাস বুঝি?' সে বলিল, 'তা নয়। যখন আমসত্ত্ব শুকোতে দেয়, আমি সেইখানে ছাতের উপর বার দুয়েক চেহারাখানা দেখিয়ে আসি। তাতেই, ত্রিসীমানার যত কাক সব ত্রাহি ত্রাহি করে ছুটে পালায়। কাজেই আর আমসত্ত্ব পাহারা দিতে হয় না।' একবার সে হঠাৎ পেন্টেলুন পরিয়া স্কুলে হাজির হইল। ঢল্‌ঢলে পায়জামার মতো পেন্টেলুন আর তাকিয়ার খোলের মতো কোট পরিয়া তাহাকে যে কিরূপ অদ্ভুত দেখাইতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতেছিল এবং সেটা তাহার কাছে ভারি একটা আমোদের ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পেন্টেলুন পরেছিস্ কেন?' দাশু একগাল হাসিয়া বলিল, 'ভালো করে ইংরিজি শিখব ব'লে।' আর একবার সে খামখা নেড়া মাথায় এক পট্টি বাঁধিয়া ক্লাশে আসিতে আরম্ভ করিল এবং আমরা সকলে তাহা লইয়া ঠাট্টাতামাশা করায়, যারপরনাই খুশি হইয়া উঠিল। দাশু আদবেই গান গাইতে পারে না, তাহার

যে তালজ্ঞান বা সুরজ্ঞান একেবারে নাই, এ কথা সে বেশ জানে। তবু সেবার ইনস্পেক্টার সাহেব যখন স্কুল দেখিতে আসেন, তখন আমাদের খুশি করিবার জন্য সে চিৎকার করিয়া গান শুনাইয়াছিল। আমরা কেহ ওরূপ করিলে সেদিন রীতিমতো শাস্তি পাইতাম কিন্তু দাশু 'পাগলা' বলিয়া তাহার কোনো শাস্তি হইল না।



একবার ছুটির পরে দাশু অদ্ভুত এক বাক্স বগলে লইয়া ক্লাশে হাজির হইল। মাস্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দাশু, ও বাক্সের মধ্যে কি এনেছ?' দাশু বলিল, 'আজ্ঞে আমার জিনিসপত্র।' জিনিসপত্রটা কিরূপ হইতে পারে, এই লইয়া আমাদের মধ্যে বেশ একটু তর্ক হইয়া গেল। দাশুর সঙ্গে বই, খাতা, পেনসিল, ছুরি সবই তো আছে, তবে আবার জিনিসপত্র কিরে বাপু? দাশুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সোজাসুজি কোনো উত্তর না দিয়া বাক্সটিকে আঁকড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, 'খবরদার, আমার বাক্স তোমরা কেউ ঘেঁটো না।' তাহার পর চাবি দিয়া বাক্সটাকে একটুখানি ফাঁক করিয়া, সে তাহার ভিতর কি যেন দেখিয়া লইল, এবং 'ঠিক আছে' বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বিড়-বিড় করিয়া হিসাব করিতে লাগিল। আমি একটুখানি দেখিবার জন্য উঁকি মারিতে গিয়াছিলাম— অমনি পাগলা মহা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরাইয়া বাক্স বন্ধ করিয়া ফেলিল।



ক্রমে আমাদের মধ্যে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বলিল, 'ওটা ওর টিফিনের বাক্স—ওর মধ্যে খাবার আছে।' কিন্তু একদিনও টিফিনের সময় তাহাকে বাক্স খুলিয়া কিছু খাইতে দেখিলাম না। কেহ বলিল, 'ওটা বোধ হয় ওর মনি-ব্যাগ—ওর মধ্যে টাকা-পয়সা আছে, তাই ও সর্বদা কাছে কাছে রাখতে চায়।' আর একজন বলিল, 'টাকা-পয়সার জন্য অত বড় বাক্স কেন? ও কি স্কুলে মহাজনী কারবার খুলবে নাকি?'

একদিন টিফিনের সময় দাশু হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া, বাক্সের চাবিটা আমার কাছে রাখিয়া গেল আর বলিল, 'এটা এখন তোমার কাছে রাখো, দেখো হারায় না যেন। আর আমার আসতে যদি একটু দেরি হয়, তবে তোমরা ক্লাশে যাবার আগে ওটা দরোয়ানের কাছে দিয়ে দিও।' এই বলিয়া সে বাক্সটি দরোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন আমাদের উৎসাহ দেখে কে! এতদিনে সুবিধে পাওয়া গিয়াছে, এখন দরোয়ানটা একটু তফাত গেলেই হয়। খানিক বাদে দরোয়ান তাহার রুটি পাকাইবার লোহার উনানটি ধরাইয়া, কতকগুলি বাসনপত্র লইয়া কলতলার দিকে গেল। আমরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, দরোয়ান আড়াল হওয়া মাত্র, আমরা পাঁচ-সাতজনে তাহার ঘরের কাছে সেই বাক্সের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তাহার পর আমি চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া দেখি বাক্সের মধ্যে বেশ ভারি একটা কাগজের পোঁটলা ন্যাকড়ার ফালি দিয়া খুব করিয়া জড়ানো। তাড়াতাড়ি পোঁটলার প্যাঁচ খুলিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে একখানা কাগজের বাক্স—তাহার ভিতরে আর একটি ছোট পোঁটলা। সেটি খুলিয়া একখানা কার্ড বাহির হইল, তাহার এক পিঠে লেখা 'কাঁচকলা খাও' আর এক পিঠে লেখা 'অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো নয়।' দেখিয়া আমরা এ-উহার মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলাম। সকলের শেষে একজন বলিয়া উঠিল, 'ছোকরা আচ্ছা যা হোক, আমাদের বেজায় ঠকিয়েছে।' আর একজন বলিল, 'যেমন ভাবে বাঁধা ছিল তেমনি করে রেখে দাও, সে যেন টেরও না পায় যে আমরা খুলেছিলাম।

তা হলে সে নিজেই জব্দ হবে।' আমি বলিলাম, 'বেশ কথা। ও আসলে পরে তোমরা খুব ভালোমানুষের মতো বাক্সটা দেখাতে বলো আর ওর মধ্যে কি আছে, সেটা বার বার করে জানতে চেয়ো।' তখন আমরা তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলি বাঁধিয়া, আগেকার মতো পোঁটলা পাকাইয়া বাক্সে ভরিয়া ফেলিলাম।

বাক্সে চাবি দিতে যাইতেছি, এমন সময় হো-হো করিয়া একটা হাসির শব্দ শোনা গেল— চাহিয়া দেখি পাঁচিলের উপরে বসিয়া পাগলা দাশু হাসিয়া কুটিকুটি। হতভাগা এতক্ষণ চুপি-চুপি তামাশা দেখিতেছিল। তখন বুঝিলাম আমার কাছে চাবি দেওয়া, দরোয়ানের কাছে বাক্স রাখা, টিফিনের সময় বাহিরে যাওয়ার ভান করা, এ সমস্ত তাহার শয়তানি। খামখা আমাদের আহাম্মক বানাইবার জন্যই সে মিছামিছি এ কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত একটা বাক্স বহিয়া বেড়াইয়াছে। সাধে কি বলি 'পাগলা দাশু?'



দাশুর খ্যাপামি

স্কুলের ছুটির দিন। স্কুলের পরেই ছাত্রসমিতির অধিবেশন হবে, তাতে ছেলেরা মিলে অভিনয় করবে। দাশুর ভারি ইচ্ছে ছিল সেও একটা কিছু অভিনয় করে।

একে-ওকে দিয়ে সে অনেক সুপারিশও করিয়েছিল, কিন্তু আমরা সবাই কোমর বেঁধে বললাম, 'সে কিছুতেই হবে না। সেই তো গতবার যখন আমাদের অভিনয় হয়েছিল তাতে দাশু সেনাপতি সেজেছিল; সেবার সে অভিনয়টা একেবারে মাটি করে দিয়েছিল। যখন ত্রিচূড়ের গুপ্তচর সেনাপতির সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করে বলল, 'সাহস থাকিলে তবে খোল তলোয়ার!' দাশুর তখন 'তবে আয় সম্মুখ সমরে'—ব'লে তখনি তলোয়ার খুলবার কথা। কিন্তু দাশুটা আনাড়ির মতো টানাটানি করতে গিয়ে তলোয়ার তো খুলতেই পারল না, মাঝ থেকে ঘাবড়ে গিয়ে কথাগুলোও বলতে ভুলে গেল। তাই দেখে গুপ্তচর আবার 'খোল তলোয়ার' ব'লে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

দাশুটা এমনি বোকা, সে অমনি 'দাঁড়া, দেখছিস না বকলস আটকিয়ে গেছে' ব'লে চেঁচিয়ে তাকে এক ধমক দিয়ে উঠল। ভাগ্যিস আমি তাড়াতাড়ি তলোয়ার খুলে দিলাম তা না হলে ঐখানেই অভিনয় বন্ধ হয়ে যেত। তারপর শেষের দিকে রাজা যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কিবা চাহ পুরস্কার কহ সেনাপতি,' তখন দাশুর বলবার কথা ছিল 'নিত্যকাল থাকে যেন রাজপদে মতি,' কিন্তু দাশুটা তা না ব'লে, তার পরের আর একটা লাইন আরম্ভ করেই, হঠাৎ জিভ কেটে 'ঐ যাঃ! ভুলে গেছিলাম' ব'লে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। আমি কটমট করে তাকাতে, সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক লাইনটা আরম্ভ করল।

তাই এবারে তার নাম হতেই আমরা জোর করে ব'লে উঠলাম, 'না, সে কিছুতেই হবে না।' বিশু বলল, 'দাশু এক্‌টিং করবে? তাহলেই চিত্তির!' ট্যাঁপা বলল, 'তার চাইতে ভজু-মালিকে ডেকে আনলেই হয়!' দাশু বেচারা প্রথম খুব মিনতি করল, তারপর চটে উঠল, তারপর কেমন মুষড়ে গিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। যে কয়দিন আমাদের তালিম চলছিল, দাশু রোজ এসে চুপটি করে হলের এক কোণায় বসে-বসে আমাদের অভিনয় শুনত। ছুটির কয়েকদিন আগে থেকে দেখি, ফোর্থ ক্লাশের ছোট গণশার সঙ্গে দাশুর ভারি ভাব হয়ে গেছে। গণশা ছেলেমানুষ, কিন্তু সে চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে—

তাই তাকে দেবদূতের পার্ট দেওয়া হয়েছে। দাশু রোজ তাকে নানারকম খাবার এনে খাওয়ায়, রঙিন পেনসিল আর ছবির বই এনে দেয়, আর বলে যে ছুটির দিন তাকে একটা ফুটবল কিনে দেবে। হঠাৎ গণশার উপর দাশুর এতখানি টান হবার কোনো কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখতে পেলাম গণশাটা খেলনা আর খাবার পেয়ে ভুলে 'দাশুদা'র একজন পরম ভক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ছুটির দিনে আমরা যখন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। আড়াইটা বাজতে-না-বাজতেই দেখা গেল, দাশুভায়া সাজঘরে ঢুকে পোশাক পরতে আরম্ভ করেছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে ? তুই এখানে কি করছিস ?' দাশু বলল, 'বাঃ, পোশাক পরব না ?' আমি বললাম, 'পোশাক পরবি কিরে ? তুই তো আর এক্‌টিং করবি না।' দাশু বলল, 'বা, খুব তো খবর রাখ। আজকে দেবদূত সাজবে



কে জানো ?' শুনে হঠাৎ আমাদের মনে কেমন একটা খটকা লাগল, আমি বললাম, 'কেন গণশার কি হল ?' দাশু বলল, 'কি হয়েছে তা গণশাকে জিজ্ঞেস করলেই পার ?' তখন চেয়ে দেখি সবাই এসেছে, কেবল গণশাই আসেনি। অমনি রামপদ, বিশু আর আমি ছুটে বেরোলাম গণশার খোঁজে।

সারা স্কুল খুঁজে, শেষটায় টিফিনঘরের পিছনে হতভাগাকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে আমাদের দেখেই পালাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু আমরা তাকে চটপট গ্রেপ্তার করে টেনে নিয়ে চললাম। গণশা কাঁদতে লাগল, 'না, আমি কক্ষনো এক্‌টিং করব না, তাহলে দাশুদা আমায় ফুটবল দেবে না।' আমরা তবু তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় অঙ্কের মাস্টার হরিবাবু সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি আমাদের দেখেই ভয়ঙ্কর চোখ লাল করে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তিন-তিনটে ধাড়ি ছেলে মিলে ঐ কচি ছেলেটার পিছনে লেগেছিস ? তোদের লজ্জাও করে না ?' ব'লেই আমাকে আর বিশুকে এক একটি চড় মেরে আর রামপদর কান ম'লে দিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন। এই সুযোগে হাতছাড়া হয়ে গণেশচন্দ্র আবার চম্পট দিল। আমরাও অপমানটা হজম করে ফিরে এলাম। এসে দেখি, দাশুর সঙ্গে রাখালের মহা ঝগড়া লেগে গেছে। রাখাল বলছে, 'তোকে আজ কিছুতেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হবে না।' দাশু বলছে, 'বেশ তো, তাহলে আর কেউ দেবদূত সাজুক, আমি রাজা কিম্বা মন্ত্রী সাজি। পাঁচ-ছটা পার্ট আমার মুখস্ত হয়ে আছে।' এমন সময় আমরা এসে খবর দিলাম যে, গণশাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। তখন অনেক তর্কবিতর্ক আর ঝগড়াঝাঁটির পর স্থির হল যে, দাশুকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই, তাকেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হোক। শুনে দাশু খুব খুশি হল আর আমাদের শাসিয়ে রাখল যে, 'আবার যদি তোরা কেউ গোলমাল করিস, তা হলে কিন্তু গতবারের মতো সব ভণ্ডুল করে দেব।'

তারপর অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম দৃশ্যে দাশু বিশেষ কিছু গোলমাল করেনি, খালি স্টেজের সামনে একবার পানের পিক্ ফেলেছিল। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে এসে সে একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। এক জায়গায় তার খালি বলবার কথা 'দেবতা বিমুখ হলে মানুষে কি পারে ?' কিন্তু সে এই কথাটুকুর আগে কোত্থেকে আরও চার-পাঁচ লাইন জুড়ে দিল। আমি তাই নিয়ে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু দাশু বলল, 'তোমরা যে লম্বা বক্তৃতা কর সে বেলা দোষ হয় না, আমি দুটো কথা বেশি বললেই যত দোষ।' এও সহ্য করা যেত, কিন্তু শেষ দৃশ্যের সময় তার মোটেই আসবার কথা নয়, তা জেনেও সে স্টেজে

আসবার জন্য জেদ ধরে বসল। আমরা অনেক কষ্টে অনেক তোয়াজ করে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, শেষ দৃশ্যে দেবদূত আসতেই পারেন না, কারণ তার আগের দৃশ্যেই আছে যে দেবদূত বিদায় নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। শেষ দৃশ্যেও আছে যে মন্ত্রী রাজাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, দেবদূত মহারাজাকে আশীর্বাদ করে স্বর্গপুরীতে প্রস্থান করেছেন। দাশু



অগত্যা তার জেদ ছাড়ল বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সে মনে-মনে একটুও খুশি হয়নি। শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম খানিকটা অভিনয়ের পর মন্ত্রী এসে সভায় হাজির হলেন। এ-কথা সে-কথার পর তিনি রাজাকে সংবাদ দিলেন, 'বার বার মহারাজে আশীষ করিয়া, দেবদূত গেল চলি স্বর্গ অভিমুখে।' বলতেই হঠাৎ কোত্থেকে 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া' ব'লে এক গাল হাসতে-হাসতে দাশু একেবারে সামনে এসে উপস্থিত। হঠাৎ এরকম বাধা পেয়ে মন্ত্রী তার বক্তৃতার খেই হারিয়ে ফেলল, আমরাও সকলে কি রকম যেন ঘাবড়িয়ে গেলাম—অভিনয় হঠাৎ বন্ধ হবার যোগাড় হয়ে এল। তাই দেখে দাশু খুব সর্দারি করে মন্ত্রীকে বলল, 'ব'লে যাও কি বলিতেছিলে।' তাতে মন্ত্রী আরও কেমন ঘাবড়িয়ে গেল। রাখাল প্রতিহারী সেজেছিল, দাশুকে কি যেন বলবার জন্যে যেই একটু এগিয়ে গেছে অমনি দাশু, 'চেয়েছিল জোর করে ঠেকাতে আমারে এই হতভাগা'—বলে এক চাঁটি মেরে তার মাথার পাগড়ি ফেলে দিল। ফেলে দিয়েই সে রাজার শেষ বক্তৃতাটা—'এ রাজ্যতে নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র যাতনা' ইত্যাদি—নিজেই গড়-গড় করে ব'লে গিয়ে, 'যাও সবে নিজ নিজ কাজে' ব'লে অভিনয় শেষ করে দিল। আমরা কি করব বুঝতে না পেরে সব বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ওদিকে ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠল আর ঝুপ করে পর্দাও নেমে গেল।
আমরা সব রেগে-মেগে লাল হয়ে দাশুকে তেড়ে ধরে বললাম, 'হতভাগা, দ্যাখ দেখি সব মাটি করলি, অর্ধেক কথাই বলা হল না।' দাশু বলল, 'বা, তোমরা কেউ কিছু বলছ না দেখেই তো আমি তাড়াতাড়ি যা মনে ছিল সেইগুলো বলে দিলাম। তা না হলে তো আরো সব মাটি হয়ে যেত।' আমি বললাম, 'তুই কেন মাঝখানে এসে সব গোল বাধিয়ে দিলি? তাইতো সব ঘুলিয়ে গেল।'

দাশু বলল, 'রাখাল কেন বলেছিল যে আমায় জোর করে আটকিয়ে রাখবে? তা ছাড়া তোমরা কেন আমায় গোড়া থেকে নিতে চাচ্ছিলে না আর ঠাট্টা করছিলে? আর রামপদ কেন বার বার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল?' রামপদ বলল, 'ওকে ধরে ঘা দু'চার লাগিয়ে দে।'

দাশু বলল, 'লাগাও না, দেখবে আমি এক্ষুনি চেচিয়ে সকলকে হাজির করি কিনা?'

চীনে পটকা

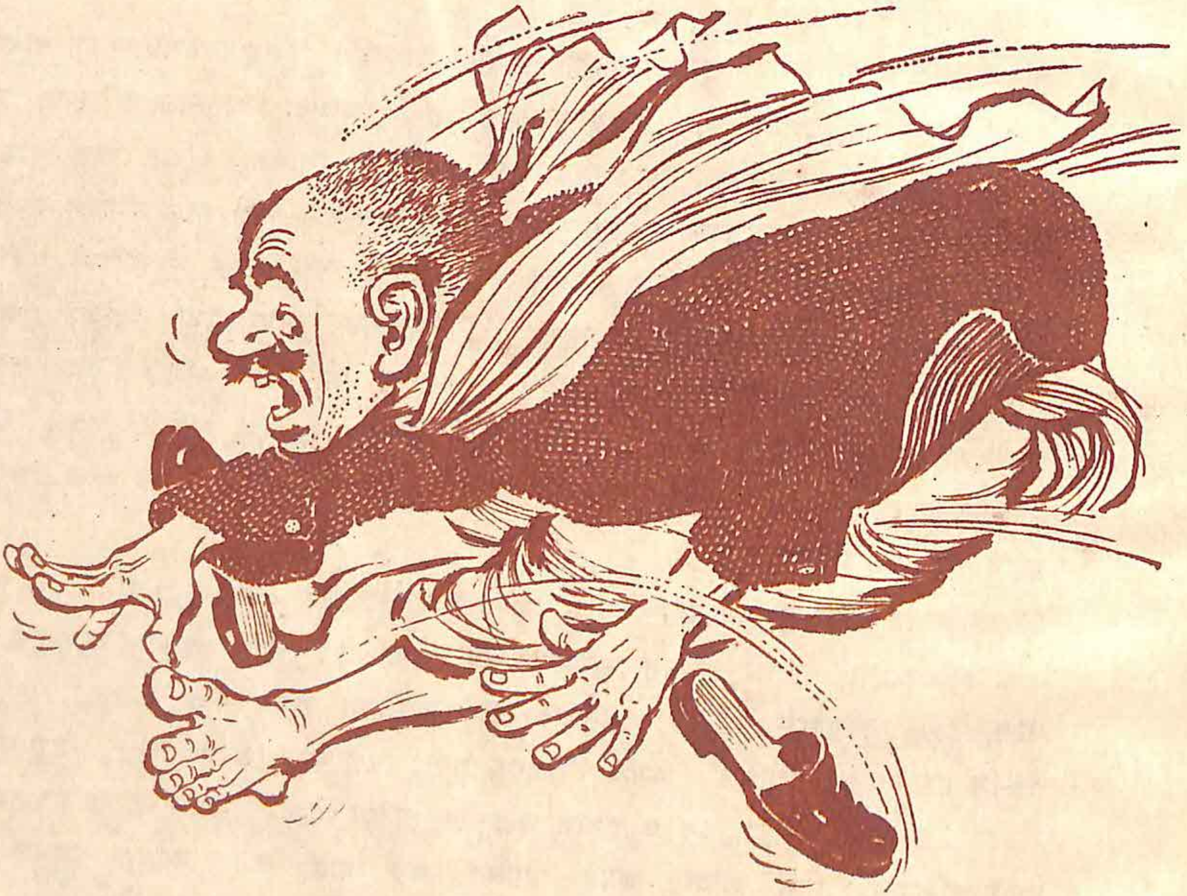
আমাদের রামপদ তাহার জন্মদিনে এক হাঁড়ি মিহিদানা লইয়া স্কুলে আসিল। টিফিনের ছুটি হওয়া মাত্র, আমরা সকলেই মহা উৎসাহে সেগুলি ভাগ করিয়া খাইলাম। খাইল না কেবল পাগলা দাশু।

পাগলা দাশু যে মিহিদানা খাইতে ভালোবাসে না, তা নয়। কিন্তু রামপদকে সে একেবারেই পছন্দ করিত না, দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া চলিত। আমরা রামপদকে বলিলাম, 'দাশুকে কিছু দে।' রামপদ বলিল, 'কিরে দাশু, খাবি নাকি? দেখিস, খাবার লোভ হয়ে থাকে তো বল্ আর আমার সঙ্গে কোনোদিন লাগতে আসবিনে—তা হলে মিহিদানা পাবি।' এমন করিয়া বলিলে তো রাগ হইবার কথা, কিন্তু দাশু কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে হাত পাতিয়া মিহিদানা লইল, তারপর দরোয়ানের ছাগলটাকে ডাকিয়া সকলের সামনে তাহাকে সেই মিহিদানা খাওয়াইল। তারপর খানিকক্ষণ হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিয়া মুচকি-মুচকি হাসিতে-হাসিতে স্কুলের বাহিরে চলিয়া গেল। এদিকে হাঁড়িটাকে শেষ করিয়া আমরা সকলে খেলায় মাতিয়া গেলাম—দাশুর কথা কেউ আর ভাবিবার সময় পাই নাই।

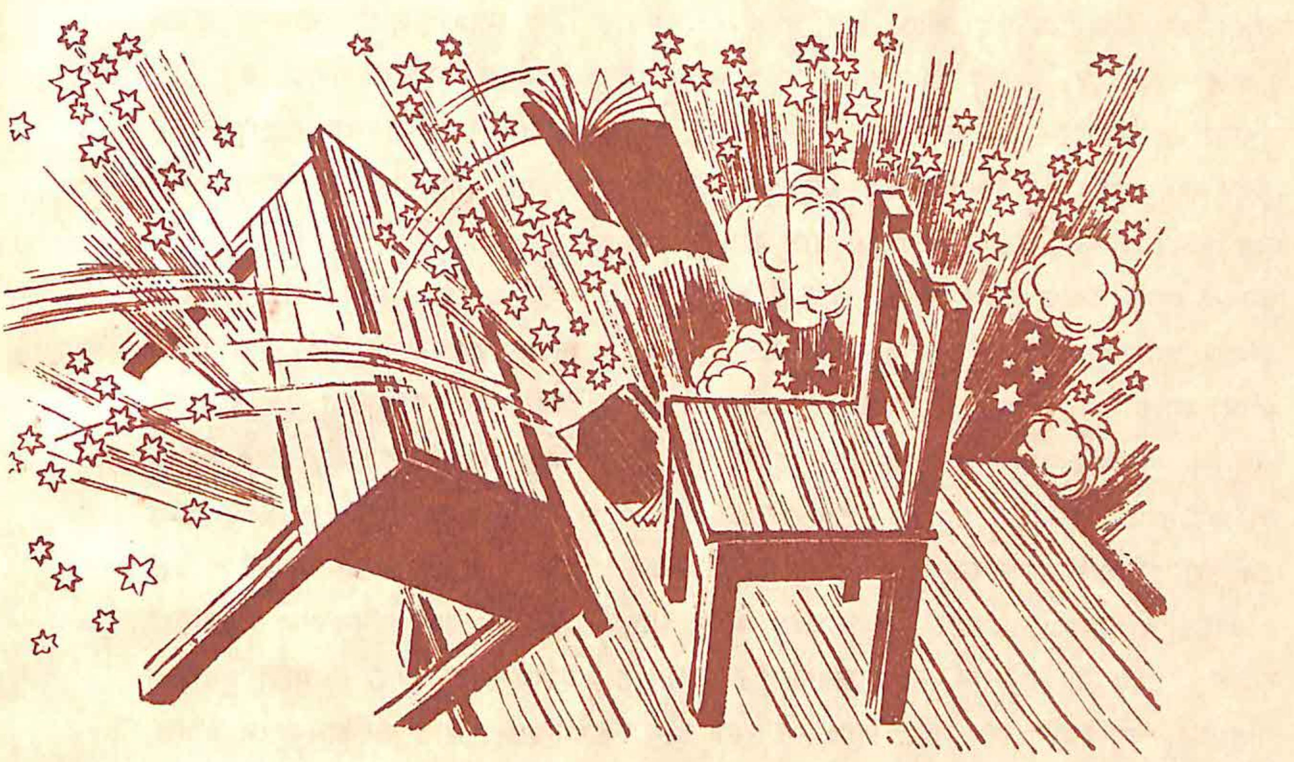
টিফিনের পর ক্লাশে আসিয়া দেখি দাশু অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে এক কোণে বসিয়া আপন মনে অঙ্ক কষিতেছে। তখনই আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিরে দাশু, কিছু করেছিস নাকি?' নিতান্ত ভালোমানুষের মতো দাশু বলিল, 'হ্যাঁ, দুটো জি-সি-এম করে ফেলেছি।' আমি বলিলাম, 'দুৎ! সে কথা কে বলেছে? কিছু দুষ্টুমির মতলব করিসনি তো?' সে এ কথায় ভয়ানক চটিয়া গেল। তখন পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশে আসিতেছিলেন, দাশু তাঁহার কাছে নালিশ করে আর কি! আমরা অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিলাম।

পণ্ডিত মহাশয় মানুষটি মন্দ নহেন। পড়ার জন্য প্রায়ই কোনো তাড়াহুড়ো করেন না। কেবল মাঝে-মাঝে একটু বেশী গোল করিলে হঠাৎ সাংঘাতিক রকম চটিয়া যান। সে সময়ে তাঁর মেজাজটি আশ্চর্য রকম ধারাল হইয়া উঠে। পণ্ডিত মহাশয় চেয়ারে বসিয়াই 'নদী শব্দের রূপ কর' বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমরা বই খুলিয়া হড়বড় করিয়া যা-তা খানিকটা বলিয়া গেলাম এবং তাহার উত্তরে, পণ্ডিত মহাশয়ের নাকের ভিতর হইতে

অতি সুন্দর ঘড়ঘড় শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, নিদ্রা বেশ গভীর হইয়াছে। কাজেই আমরাও শ্লেট লইয়া 'কাটকুট' আর 'দশ-পঁচিশ' খেলা শুরু করিলাম। কেবল মাঝে-মাঝে যখন ঘড়ঘড়ানি কমিয়া আসিত তখন সবাই মিলিয়া সুর করিয়া 'নদী নদ্যৌ' ইত্যাদি আওড়াইতাম। দেখিতাম, তাহাতে ঘুমপাড়ানি গানের মতো খুব আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।



সকলে খেলায় মত্ত, কেবল দাশু এক কোণায় বসিয়া কি যেন করিতেছে, সেদিকে আমাদের খেয়াল নাই। একটু বাদে পণ্ডিত মহাশয়ের চেয়ারের তলায় তক্তার নিচ হইতে ফট্ করিয়া কি একটা আওয়াজ হইল। পণ্ডিত মহাশয় ঘুমের ঘোরে ভ্রূকুটি করিয়া সবেমাত্র 'উঃ' বলিয়া কি যেন একটা ধমক দিতে যাইবেন, এমন সময় ফুট্‌ফাট্ দুম্‌দাম্ ধুপ্‌ধাপ্ শব্দে তাণ্ডব কোলাহল উঠিয়া, সমস্ত স্কুলটিকে একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। মনে হইল যেন, যত রাজ্যের মিস্ত্রী-মজুর সবাই এক জোটে বিকট তালে ছাত পিটাইতে



লাগিয়াছে—দুনিয়ার যত কাঁসারি আর লাঠিয়াল সবাই যেন পাল্লা দিয়া হাতুড়ি আর লাঠি ঠুকিতেছে। খানিকক্ষণ পর্যন্ত আমরা, যাকে পড়ার বইয়ে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বলে, তেমনি হইয়া হাঁ করিয়া রহিলাম। পণ্ডিত মহাশয় একবার মাত্র বিকট শব্দ করিয়া, তারপর হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া এক লাফে টেবিল ডিঙ্গাইয়া, একেবারে ক্লাশের মাঝখানে ধড়ফড় করিয়া পড়িয়া গেলেন। সরকারী কলেজের নবীন পাল বরাবরই হাই জাম্পে ফার্ষ্ট প্রাইজ পায়, তাহাকেও আমরা এরকম সাংঘাতিক লাফাইতে দেখি নাই। পাশের ঘরে নিচের ক্লাশের ছেলেরা চিৎকার করিয়া 'কড়াকিয়া' নামতা আওড়াইতেছিল—তারাও হঠাৎ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেল। দেখিতে-দেখিতে স্কুলময় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল—দরোয়ানের কুকুরটা পর্যন্ত যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া বিকট কেঁউ-কেঁউ শব্দে গোলমালের মাত্রা ভীষণ রকম বাড়াইয়া তুলিল।

মিনিট-পাঁচেক ভয়ানক আওয়াজের পর যখন সব ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'কিসের শব্দ হইয়াছিল দেখ।' দরোয়ানজি একটা লম্বা বাঁশ দিয়া অতি সাবধানে আস্তে আস্তে, তক্তার নিচ হইতে একটা হাঁড়ি ঠেলিয়া বাহির করিল—রামপদর সেই হাঁড়িটা, তখনও তাহার মুখের কাছে একটুখানি মিহিদানা লাগিয়া ছিল। পণ্ডিত মহাশয়

ভয়ানক ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, 'এ হাঁড়িটি কার ?' রামপদ বলিল, 'আজ্ঞে আমার।' আর কোথা যায়—অমনি দুই কানে দুই পাক। 'হাঁড়িতে কি রেখেছিলি!' রামপদ তখন বুঝিতে পারিল যে, গোলমালের জন্য সমস্ত দোষ তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে। সে বেচারা তাড়াতাড়ি বুঝাইতে গেল, 'আজ্ঞে ওর মধ্যে মিহিদানা এনেছিলাম, তারপর—' মুখের কথা শেষ না হইতেই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'তারপর মিহিদানাগুলো চীনে পটকা হয়ে ফুটতে লাগল, না ?' বলিয়াই ঠাস্-ঠাস্ করিয়া দুই চড়।

অন্যান্য মাস্টারেরাও ক্লাসে আসিয়া জড় হইয়াছিলেন ; তাঁহারাও এক বাক্যে হাঁ-হাঁ করিয়া রুখিয়া আসিলেন। আমরা দেখিলাম বেগতিক। বিনাদোষে রামপদ বেচারা মার খায় বুঝি! এমন সময় দাশু আমার শ্লেটখানা লইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে দেখাইয়া বলিল, 'এই দেখুন। আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন ওরা শ্লেট নিয়ে খেলা করছিল—এই দেখুন কাটকুটের ঘর কাটা!' শ্লেটের উপর আমার নাম লেখা, পণ্ডিত মশাই আমার উপর প্রচণ্ড এক চড় তুলিয়াই হঠাৎ কেমন থতমত খাইয়া গেলেন। তারপর দাশুর দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, 'চোপরও, কে বলেছে আমি ঘুমোচ্ছিলাম ?' দাশু খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া বলিল, 'তবে যে আপনার নাক ডাকছিল ?' পণ্ডিত মহাশয় তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, 'বটে? ওরা সব খেলা কচ্ছিল? আর তুমি কি কচ্ছিলে? দাশু অম্লানবদনে বলিল, 'আমি পটকায় আগুন দিচ্ছিলাম।' শুনিয়াই সকলের চক্ষুস্থির! ছোকরা বলে কি ?

প্রায় আধ মিনিটখানেক কাহারও মুখে আর কথা নাই। তারপর পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ একেবারে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, 'কেন পটকায় আগুন দিচ্ছিলে ?' দাশু ভয় পাইবার ছেলেই নয়, সে রামপদকে দেখাইয়া বলিল, 'ও কেন আমায় মিহিদানা দিতে চাচ্ছিল না ?' এরূপ অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া রামপদ বলিল, 'আমার মিহিদানা, আমি যা ইচ্ছা তাই করব।' দাশু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, 'তাহলে আমার পটকা, আমিও যা ইচ্ছা তাই করব।' এরূপ পাগলের সঙ্গে আর তর্ক করা চলে না! কাজেই মাস্টারেরা সকলেই কিছু-কিছু ধমক-ধামক করিয়া যে যার ক্লাসে চলিয়া গেলেন। সে 'পাগলা' বলিয়া তাহার কোনো শাস্তি হইল না। ছুটির পর আমরা সবাই মিলিয়া কত চেষ্টা করিয়াও তাহার দোষ বুঝাইতে পারিলাম না। সে বলিল, 'আমার পটকা, রামপদর হাঁড়ি। যদি আমার দোষ হয়, তা হলে রামপদরও দোষ হয়েছে। বাস্! ওর মার খাওয়াই উচিত।'

দাশুর কীর্তি

নবীনচাঁদ স্কুলে এসেই বলল, কাল তাকে ডাকাতে ধরেছিল। শুনে স্কুল শুদ্ধ সবাই হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসল। 'ডাকাতে ধরেছিল?' বলিস কিরে!' ডাকাত না তো কি? বিকাল বেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরবার সময় ডাকাতরা তাকে ধরে তার মাথায় চাঁটি মেরে, তার নতুন কেনা শখের পিরানটিতে কাদাজলের পিচকিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় ব'লে গেল, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক—নইলে দড়াম করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।' তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল, এমন সময় তার বড়মামা এসে তার কান ধরে বাড়িতে নিয়ে বললেন, 'রাস্তায় সঙ সেজে এয়ার্কি করা হচ্ছিল?' নবীনচাঁদ কাঁদ-কাঁদ গলায় ব'লে উঠল, 'আমি কি করব? আমায় ডাকাতে ধরেছিল—' শুনে তার মামা প্রকাণ্ড এক চড় তুলে বললেন, 'ফের জ্যাঠামি।' নবীনচাঁদ দেখল, মামার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা - কারণ,সত্যিসত্যিই তাকে যে ডাকাতে ধরেছিল, একথা তার বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত! সুতরাং তার মনের দুঃখ এতক্ষণ মনের মধ্যেই চাপা ছিল।

যাহোক, স্কুলে এসে তার দুঃখ অনেকটা বোধ হয় দূর হতে পেরেছিল, কারণ স্কুলে অন্তত অর্ধেক ছেলে তার কথা শুনবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল, এবং তার প্রত্যেকটি ঘামাচি, ফুসকড়ি আর চুলকানির দাগটি পর্যন্ত তারা আগ্রহ করে ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ ব'লে স্বীকার করেছিল। দু-একজন যারা তার কনুয়ের আঁচড়টাকে পুরনো ব'লে সন্দেহ করেছিল তারাও বলল যে হাঁটুর কাছে যে ছড়ে গেছে সেটা একেবারে টাটকা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মতো ছিল সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বললে, 'ওটা তো জুতোর ফোস্কা'—তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চটে বললে, 'যাও তোমাদের কাছে আর কিছুই বলব না।' কেষ্টাটার জন্য আমাদের আর কিছু শোনাই হল না।

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে, ঢং-ঢং করে স্কুলের ঘন্টা পড়ে গেল। সবাই যে যার ক্লাশে চলে গেলাম, এমন সময় দেখি, পাগলা দাশু এক গাল হাসি নিয়ে ক্লাশে ঢুকছে। আমরা বললাম, 'শুনেছিস্? কাল নবুকে ডাকাতে ধরেছিল।' যেমন বলা অমনি দাশরথি হঠাৎ হাত পা ছুঁড়ে বই-টই ফেলে, খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ করে হাসতে-হাসতে হাসতে-হাসতে একেবারে মেঝের উপর বসে পড়ল। পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি করে, একবার চিৎ হয়ে, একবার উপুড় হয়ে,

তার হাসি আর কিছুতেই থামে না। দেখে আমরা তো অবাক ! পণ্ডিত মশাই ক্লাশে এসেছেন, তখনও পুরোদমে তার হাসি চলছে। সবাই ভাবলে, 'ছোঁড়াটা ক্ষেপে গেল না কি ?' যাহোক, খুব খানিকটা হুটোপাটির পর সে ঠাণ্ডা হয়ে, বইটই গুটিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বসল। পণ্ডিত মশাই বললেন, 'ওরকম হাসছিলে কেন ?' দাশু নবীনকে দেখিয়ে বললে, 'ঐ ওকে দেখে।' পণ্ডিত মশাই খুব কড়া রকমের ধমক লাগিয়ে তাকে ক্লাশের কোণায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। কিন্তু পাগলার তাতেও লজ্জা নেই, সে সারাটি ঘন্টা থেকে-থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল করে ফিক্-ফিক্ করে হাসতে লাগল। টিফিনের ছুটির সময় নবু দাশুকে চেপে ধরল





'কিরে দেশো। বড় যে হাসতে শিখেছিস!' দাশু বললে, 'হাসব না? তুমি কাল ধুচনি মাথায় দিয়ে কিরকম নাচটা নেচেছিলে, সে তো আর তুমি নিজে দেখনি? দেখলে বুঝতে কেমন মজা!' আমরা সবাই বললাম, 'সে কি রকম? ধুচনি মাথায় নাচছিল মানে?' দাশু বললে, 'তাও জান না? ওই কেষ্টা আর জগাই—ঐ যা। বলতে না বারণ করেছিল!' আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কি বলছিস ভালো করেই বল না।' দাশু বললে, 'কালকে শেঠেদের বাগানের পিছন দিয়ে নবু একলা একলা বাড়ি যাচ্ছিল, এমন সময় দুটো ছেলে—তাদের নাম বলতে বারণ—তারা দৌড়ে এসে নবুর মাথায় ধুচনির মতো কি একটা চাপিয়ে, তার গায়ের উপর আচ্ছা করে পিচকিরি দিয়ে পালিয়ে গেল।' নবু ভয়ানক রেগে বললে, 'তুই তখন কি করছিলি?' দাশু বললে, 'তুমি তখন মাথার থলি খুলবার জন্য ব্যাঙের মতো হাত পা ছুঁড়ে লাফাচ্ছিলে দেখে আমি বললাম—ফের নড়বি তো দড়াম করে মাথা উড়িয়ে দেব। শুনে তুমি রাস্তার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে, তাই আমি তোমার বড়মামাকে ডেকে আনলাম।' নবীনচাঁদের যেমন বাবুয়ানা তেমনি তার দেমাক—সেই জন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না,

তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুশি হলাম। ব্রজলাল ছেলেমানুষ, সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বললে, 'তবে যে নবীনদা বলছিল, তাকে ডাকাতে ধরেছে?' দাশু বললে, 'দূর বোকা! কেষ্টা কি ডাকাত?' বলতে না বলতেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির। কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাশে পড়ে, তার গায়েও বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে দেখামাত্র শিকারী বেড়ালের মতো ফুলে উঠল কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না, খানিকক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। আমরা ভাবলাম গোলমাল মিটে গেল। কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময় দেখি, নবীন তার দাদা মোহনচাঁদকে নিয়ে হন্‌হন্‌ করে আমাদের দিকে আসছে। মোহনচাঁদ ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে, সে আমাদের চাইতে অনেক বড়, তাকে ওরকম ভাবে আসতে দেখেই আমরা বুঝলাম, এবার একটা কাণ্ড হবে। মোহন এসেই বলল, 'কেষ্টা কই?' কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখেই কোথায় সরে পড়েছে, তাই তাকে আর পাওয়া গেল না।



তখন নবীনচাঁদ বললে, 'ওই দাশুটা সব জানে, ওকে জিজ্ঞাসা কর।' মোহন বললে, 'কিহে ছোকরা, তুমি সব জানো নাকি?' দাশু বললে, 'না, সব আর জানব কোত্থেকে—এইতো সবে ফোর্থ ক্লাশে পড়ি, একটু ইংরিজি জানি, ভূগোল বাংলা জিওমেটরি—' মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বললে, 'সেদিন নবুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জানো কিনা?' দাশু বললে, 'ঠ্যাঙায়নি তো—মেরেছিল, খুব অল্প মেরেছিল।' মোহন একটুখানি ভেংচিয়ে বললে, 'খুব অল্প মেরেছে, না? তবু কতখানি শুনি?' দাশু বললে, 'সে কিছুই না—ওরকম মারলে, একটুও লাগে না।' মোহন আবার ব্যঙ্গ করে বললে, 'তাই নাকি? কি রকম মারলে পরে লাগে?' দাশু খানিকটা মাথা চুলকিয়ে তারপর বললে, 'ঐ সেবার হেডমাস্টার মশাই তোমায় যেমন বেত মেরেছিলেন সেই রকম।' এ কথায় মোহন ভয়ানক চটে দাশুর কান ম'লে চিৎকার করে বলল, 'দেখ বেয়াদব! ফের জ্যাঠামি করবি তো চাবকিয়ে লাল করে দেব। কাল তুই সেখানে ছিলি কিনা, আর কি কি দেখেছিলি সব খুলে বলবি কিনা?'

জানোই তো দাশুর মেজাজ কেমন পাগলাটে গোছের, সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে তারপর হঠাৎ মোহনচাঁদকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে বসল। কিল ঘুঁষি চড়, আঁচড় কামড়, সে এমনি চটপট চালিয়ে গেল যে আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। মোহন বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি যে ফোর্থ ক্লাশের একটা রোগা ছেলে তাকে অমন ভাবে তেড়ে আসতে সাহস পাবে—তাই সে একেবারে থতমত খেয়ে কেমন যেন লড়তেই পারল না। দাশু তাকে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে মাটিতে চিৎ করে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল।' ম্যাট্রিক ক্লাশের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা যদি মোহনকে সামলে না ফেলত, তাহলে সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানোই মুশকিল হত।

পরে একদিন কেষ্টাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'হ্যাঁরে, নবুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন?' কেষ্টা বললে, 'ঐ দাশুটাই তো শিখিয়েছিল ওরকম করতে। আর বলেছিল, তা হলে একসের জিলিপি পাবি।' আমরা বললাম, 'কৈ, আমাদের তো ভাগ দিলিনে?' কেষ্টা বলল, 'সে কথা আর বলিস কেন? জিলিপি চাইতে গেলুম, হতভাগা বলে কিনা আমার কাছে কেন? ময়রার দোকানে যা পয়সা ফেলে দে, যত চাস জিলিপি পাবি।'

আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচকেমি করে?

চালিয়াত

শ্যামচাঁদের বাবা কোন একটা সাহেব-অফিসে মস্ত বড় কাজ করিতেন, তাই শ্যামচাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদে, রকম-সকমে কায়দার আর অন্ত ছিল না। সে যখন দেড় বিঘৎ চওড়া কলার আঁটিয়া, রঙিন ছাতা মাথায় দিয়া, নতুন জুতার মচ্‌মচ্ শব্দে গম্ভীর চালে ঘাড় উঁচাইয়া স্কুলে আসিত, তাহার সঙ্গে পাগড়ি-বাঁধা তক্‌মা-আঁটা চাপরাশি এক রাজ্যের বই ও টিফিনের বাক্স বহিয়া আনিত, তখন তাহাকে দেখাইত ঠিক যেন পেখমধরা ময়ূরটির মতো। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা হাঁ করিয়া অবাক হইয়া থাকিত, কিন্তু আমরা সবাই একবাক্যে বলিতাম, 'চালিয়াত'।

বয়সের হিসাবে শ্যামচাঁদ একটু বেঁটে ছিল। পাছে কেহ তাহাকে ছেলেমানুষ ভাবে, এবং যথোপযুক্ত খাতির না করে, এই জন্য সর্বদাই সে অত্যন্ত বেশি রকম গম্ভীর হইয়া থাকিত এবং কথাবার্তায় নানা রকম বোলচাল দিয়া এমন বিজ্ঞের মতো ভাব প্রকাশ করিত যে স্কুলের দরোয়ান হইতে নিচের ক্লাশের ছাত্র পর্যন্ত সকলেই ভাবিত, 'নাঃ, লোকটা কিছু জানে!' শ্যামচাঁদ প্রথমে যে বার ঘড়ি-চেইন আঁটিয়া স্কুলে আসিল, তখন তাহার কাণ্ড যদি দেখিতে! পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়িটাকে বাহির করিয়া সে কানে দিয়া শুনিত, ঘড়িটা চলে কিনা! স্কুলের যেখানে যত ঘড়ি আছে, সব কটার ভুল তাহার দেখানো চাই-ই চাই। পাঁড়েজি দরোয়ানকে সে রীতিমতো ধমক লাগাইয়া বলিল, 'এইও! স্কুলের ক্লক্‌টাতে যখন চাবি দাও, তখন সেটাকে রেগুলেট কর না কেন? ওটাকে অয়েল করতে হবে—ক্রমাগতই শ্লো চলছে।' পাঁড়েজির চৌদ্দ পুরুষে কেউ কখনও ঘড়ি 'অয়েল' বা 'রেগুলেট' করে নাই। সে যে সপ্তাহে একদিন করিয়া চাবি ঘুরাইতে শিখিয়াছে, ইহাতেই তাহার দেশের লোকের বিস্ময়ের সীমা নাই। কিন্তু দেশভাইদের কাছে মানরক্ষা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'হাঁ, হাঁ, আভি হাম্ রেংলিট কর্‌বে।' পাঁড়েজির উপর একচাল চালিয়া শ্যামচাঁদ ক্লাশে ফিরিতেই এক পাল ছোট ছেলে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। শ্যামচাঁদ তাহাদের কাছে মহা আড়ম্বর করিয়া শ্লো, ফাস্ট, মেইন স্প্রিং, রেগুলেট প্রভৃতি ঘড়ির সমস্ত রহস্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

একবার আমাদের একটি নতুন মাস্টার ক্লাশে আসিয়াই শ্যামচাঁদকে 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। লজ্জায় ও অপমানে শ্যামচাঁদের মুখ কান একেবারে লাল হইয়া উঠিল—সে

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আমার নাম শ্যামচাঁদ ঘটক।' মাস্টার মহাশয় অত কি বুঝিবেন, বলিলেন, 'শ্যামচাঁদ ? আচ্ছা বেশ, খোকা বস।' তারপর কয়েকদিন ধরিয়া স্কুল সুদ্ধ ছেলে তাহাকে 'খোকা' 'খোকা' করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু কয়দিন পরেই শ্যামচাঁদ ইহার শোধ লইয়া ফেলিল। সেদিন সে ক্লাশে আসিয়াই পকেট হইতে কালো চোঙ্গার মতো কি একটা বাহির করিল। মাস্টার মহাশয়, শাদাসিধা ভালোমানুষ, তিনি বলিলেন, 'কি হে খোকা, থারমোমিটার এনেছ যে। জ্বর-টর হয় নাকি ?' শ্যামচাঁদ বলিল, 'আজ্ঞে, না—থারমোমিটার নয়—ফাউন্টেন পেন!' শুনিয়া সকলের চক্ষু স্থির। ফাউন্টেন পেন! মাস্টার এবং ছেলে সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে আসিলেন ব্যাপারখানা কি! শ্যামচাঁদ বলিল, 'এই একটা ভাল্‌কেনাইট্‌ টিউব, তার মধ্যে কালি ভরা আছে।' একটা ছেলে উৎসাহে বলিয়া উঠিল, 'ও বুঝিছি, পিচকিরি বুঝি ?' শ্যামচাঁদ কিছু জবাব না দিয়া, খুব মাতব্বরের মতো একটুখানি মুচকি হাসিয়া, কলমটিকে খুলিয়া তাহার সোনালি নিবখানা দেখাইয়া বলিল, 'ওতে ইরিডিয়াম আছে—সোনার চেয়েও বেশী দাম।' তারপর যখন সে একখানা খাতা লইয়া, সেই আশ্চর্য কলম দিয়া তরতর করিয়া নিজের নাম লিখিতে লাগিল, তখন স্বয়ং মাস্টার মহাশয় পর্যন্ত বড় বড় চোখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর, শ্যামচাঁদ কলমটিকে তাঁর হাতে দিবামাত্র তিনি ভারি খুশি হইয়া সেটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দুই ছত্র লিখিয়া বলিলেন, 'কি কলমই বানিয়েছে, বিলিতি কোম্পানি বুঝি ?' শ্যামচাঁদ চট্‌পট্‌ বলিয়া ফেলিল, 'আমেরিকান স্টাইলো এণ্ড ফাউন্টেন পেন কো, ফিলাডেল্‌ফিয়া।'

ক্রমে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। ছুটির দিন স্কুলের উদ্যানে প্রকাণ্ড শামিয়ানা খাটানো হইল, কলিকাতা হইতে কে এক বাজিওয়ালা আসিয়াছেন, তিনি ম্যাজিক দেখাইবেন। যথাসময়ে সকলে আসিলেন, মাস্টার ছাত্র লোকজন নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সকলে মিলিয়া উঠান সিঁড়ি রেলিং পাঁচিল একেবারে ভরিয়া ফেলিয়াছে। ম্যাজিক চলিতে লাগিল। একখানা শাদা রুমাল চোখের সামনেই লাল নীল সবুজের কারিকুরিতে রঙিন হইয়া উঠিল। একজন লোক একটা সিদ্ধ ডিম গিলিয়া মুখের মধ্য হইতে এগারোটা আস্ত ডিম বাহির করিল। ডেপুটিবাবুর কোচম্যানের দাড়ি নিংড়াইয়া প্রায় ৫০টি টাকা বাহির করা হইল। তারপর ম্যাজিকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, 'কারও কাছে ঘড়ি আছে ?' শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'আমার ঘড়ি আছে।' ম্যাজিকওয়ালা তাহার ঘড়িটি লইয়া খুব গম্ভীরভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘড়িটির খুব প্রশংসা করিয়া বলিল, 'তোফা ঘড়ি তো!' তারপর

চেনশুদ্ধ ঘড়িটাকে একটা কাগজে মুড়িয়া, একটা হামানদিস্তায় দমাদম্ ঠুকিতে লাগিল। তারপর কয়েক টুকরা ভাঙা লোহা আর কাঁচ দেখাইয়া শ্যামচাঁদকে বলিল, 'এইটা কি তোমার ঘড়ি?' শ্যামচাঁদের অবস্থা বুঝিতেই পার! সে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, দু-তিন বার কি যেন বলিতে গিয়া আবার থামিয়া গেল। শেষটায় অনেক কষ্টে একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, রুমাল দিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িল। যাহা হউক, খানিক বাদে যখন একখানা পাঁউরুটির মধ্যে ঘড়িটাকে আস্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন চালিয়াত খুব হো-হো; করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন, তামাশাটা সে আগাগোড়াই বুঝিতে পারিয়াছে।

সব শেষে ম্যাজিকওয়ালা নানাজনের কাছে নানারকম জিনিস চাহিয়া লইল—চশমা, আংটি, মনিব্যাগ, রূপার পেনসিল প্রভৃতি আট-দশটি জিনিস সকলের সামনে এক সঙ্গে পোঁটলা বাঁধিয়া, শ্যামচাঁদকে ডাকিয়া তাহার হাতে পোঁটলাটি দেওয়া হইল। শ্যামচাঁদ বুক ফুলাইয়া পোঁটলাহাতে দাঁড়াইয়া রহিল আর ম্যাজিকওয়ালা লাঠি ঘুরাইয়া, চোখ-টোখ পাকাইয়া, বিড়-বিড় করিয়া কি সব বকিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ শ্যামচাঁদের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, 'জিনিসগুলো ফেললে কোথায়?' শ্যামচাঁদ পোঁটলা দেখাইয়া বলিল, 'এই যে।' ম্যাজিকওয়ালা মহা খুশি হইয়া বলিল, 'সাবাস ছেলে! দাও, পোঁটলা খুলে যার যার জিনিস ফেরত দাও।' শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি পোঁটলা খুলিয়া দেখে, তাহার মধ্যে খালি কয়েক টুকরো কয়লা আর ঢিল! তখন ম্যাজিকওয়ালার তম্বি দেখে কে? সে কপালে হাত ঠুকিয়া বলিতে লাগিল, 'হায়, হায়, আমি ভদ্রলোকের কাছে মুখ দেখাই কি করে? কেনই বা ওর কাছে দিতে গেছিলাম? ওহে, ওসব তামাশা এখন রাখ, আমার জিনিসগুলো এবার ফিরিয়ে দাও দেখি?'

শ্যামচাঁদ হাসিবে কি কাঁদিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কানের মধ্যে হইতে আংটি, চুলের মধ্যে পেনসিল, আস্তিনের মধ্যে চশমা—এইরূপে একটি একটি জিনিস উদ্ধার করিতে লাগিল।

আমরা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম—শ্যামচাঁদও প্রাণপণে হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত জিনিসের হিসাব মিলাইয়া ম্যাজিকওয়ালা যখন তাহাকে বলিল, 'আর কি নিয়েছ?'

তখন সে বাস্তবিকই ভয়ানক রাগিয়া বলিল, 'ফের মিছে কথা! কখনো আমি কিচ্ছু নিইনি।'

তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কোটের পিছন হইতে জ্যান্ত একটা পায়রা বাহির করিয়া বলিল, 'এটা বুঝি কিছু নয় ?'

এবার শ্যামচাঁদ একেবারে ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর পাগলের মতো হাত পা ছুঁড়িয়া সভা হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। আমরা সবাই আহলাদে আত্মহারা হইয়া চেঁচাইতে লাগিলাম—চালিয়াত ! চালিয়াত !



সবজান্তা

আমাদের 'সবজান্তা' দুলিরামের বাবা কোন একটা খবরের কাগজের সম্পাদক। সেই জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে তাহার সমস্ত কথার উপরে অগাধ বিশ্বাস দেখা যাইত। যে কোনো বিষয়েই হোক, জার্মানির লড়াইয়ের কথাই হোক আর মোহনবাগানের ফুটবলের ব্যাখ্যাই হোক, দেশের বড় লোকদের ঘরোয়া গল্পই হোক, আর নানারকম উৎকট রোগের বর্ণনাই হোক, যে কোনো বিষয়ে সে মতামত প্রকাশ করিত। একদল ছাত্র অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সকল কথা শুনিত। মাস্টার মহাশয়দের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ে তাহার ভারি পক্ষপাতী ছিলেন। দুনিয়ার সকল খবর লইয়া সে কারবার করে, সেইজন্য, পণ্ডিত মহাশয় তাহার নাম দিয়াছিলেন 'সবজান্তা'। আমার কিন্তু বরাবরই বিশ্বাস ছিল যে, সবজান্তা যতখানি পাণ্ডিত্য দেখায় আসলে তাহার অনেকখানি উপরচালাকি। দু-চারিটি বড় বড় শোনা কথা, আর খবরের কাগজ পড়িয়া দু-দশটা খবর এইমাত্র তাহার পুঁজি, তারই উপর রঙচঙ দিয়া নানারকম বাজে গল্প জুড়িয়া সে তাহার বিদ্যা জাহির করিত। একদিন আমাদের ক্লাশে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে সে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের গল্প করিয়াছিল। তাহাতে সে বলে যে, নায়েগ্রা দশ মাইল উঁচু ও একশত মাইল চওড়া! একজন ছাত্র বলিল, 'সে কি করে হবে? এভারেস্ট সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, সেই মোটে পাঁচ মাইল।' সবজান্তা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, 'তোমরা তো আজকালকার খবর রাখ না। যখনই তাহার কোনো কথায় আমরা সন্দেহ বা আপত্তি করিতাম, সে একটা যা তা নাম করিয়া আমাদের ধমক দিয়া বলিত, তোমরা কি অমুকের চাইতে বেশি জানো?' আমরা বাহিরে সব সহ্য করিয়া থাকিতাম, কিন্তু এক এক সময় রাগে গা জ্বলিয়া যাইত। সবজান্তা যে আমাদের মনের ভাবটা বুঝিত না, তাহা নয়। সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিত এবং সর্বদাই এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, আমরা তাহার কথাগুলি মানি বা না মানি, তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। নানারকম খবর ও গল্প জাহির করিবার সময়, মাঝে মাঝে আমাদের শুনাইয়া বলিত, 'অবিশ্যি, কেউ কেউ আছেন, যাঁরা এসব কথা মানবেন না' অথবা 'যাঁরা না পড়েই খুব বুদ্ধিমান তাঁরা নিশ্চয়ই এসব উড়িয়ে দিতে চাইবেন'—ইত্যাদি। ছোকরা বাস্তবিকই অনেক রকম খবর রাখিত, তার উপর তার বোলচালগুলিও ছিল বেশ ঝাঁঝালো রকমের, কাজেই আমরা বেশি তর্ক করিতে সাহস পাইতাম না। তাহার পরে একদিন, কি কুক্ষণে, তাহার এক মামা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া, আমাদেরই

স্কুলের কাছে বাসা লইয়া বসিলেন। তখন আর সবজান্তাকে পায় কে! তাহার কথাবার্তার দৌড় এমন আশ্চর্য রকম বাড়িয়া চলিল যে, মনে হইত বুঝিবা তাহার পরামর্শ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পুলিশের পেয়াদা পর্যন্ত কাহারও কাজ চলিতে পারে না। স্কুলের ছাত্র মহলে তাহার খাতির ও প্রতিপত্তি এমন আশ্চর্য রকম জমিয়া গেল যে, আমরা কয়েক বেচারা, যাহারা বরাবর তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছি—একেবারে কোণঠাসা হইয়া রহিলাম। এমন কি আমাদের মধ্য হইতে দু-একজন তাহার দলে যোগ দিতেও আরম্ভ করিল।

অবস্থাটা শেষটায় এমন দাঁড়াইল যে, স্কুলে আমাদের আর টেঁকা দায়! দশটার সময় মুখ কাঁচুমাচু করিয়া ক্লাশে ঢুকিতাম আর ছুটি হইলেই সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপ হাসি-তামাশার হাত এড়াইবার জন্য দৌড়িয়া বাড়ি আসিতাম। টিফিনের সময়টুকু হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের সামনে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো পড়াশুনা করিতাম।

এই রকম ভাবে কতদিন চলিত জানি না, কিন্তু একদিনের একটি ঘটনায় হঠাৎ সবজান্তা মহাশয়ের জারিজুরি সব এমনই ফাঁস হইয়া গেল যে, তাহার অনেকদিনকার খ্যাতি ঐ একদিনেই লোপ পাইল—আর আমরাও সেইদিন হইতে একটু মাথা তুলিতে পারিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেই ঘটনারই গল্প বলিতেছি।

একদিন শোনা গেল, লোহারপুরের জমিদার রামলালবাবু আমাদের স্কুলে তিন হাজার টাকা দিয়াছেন—একটি ফুটবল গ্রাউণ্ড ও খেলার সরঞ্জামের জন্য। আরও শুনিলাম রামলালবাবুর ইচ্ছা সেই উপলক্ষে আমাদের একদিন ছুটি ও একদিন রীতিমতো ভোজের আয়োজন হয়। কয়দিন ধরিয়া এই খবরটাই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। কবে ছুটি পাওয়া যাইবে, কবে খাওয়া এবং কি খাওয়া হইবে, এই সকল বিষয়ে জল্পনা চলিতে লাগিল। সবজান্তা দুলিরাম বলিল, যেবার সে দার্জিলিঙ গিয়াছিল, সেবার নাকি রামলালবাবুর সঙ্গে তাহার দেখা-সাক্ষাৎ এমন কি আলাপ-পরিচয় পর্যন্ত হইয়াছিল। রামলালবাবু তাহাকে কেমন খাতির করিতেন, তাহার কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া কি কি প্রশংসা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সে স্কুলের আগে এবং পরে, সারাটি টিফিনের সময় এবং সুযোগ পাইলে ক্লাশের পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকেও নানা অসম্ভব রকম গল্প বলিত। 'অসম্ভব' বলিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেলার দল সে সকল কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে একটুও বাধা বোধ করিত না। একদিন টিফিনের সময় উঠানের বড় সিঁড়িটার উপর একদল ছেলের সঙ্গে বসিয়া সবজান্তা গল্প আরম্ভ করিল ঃ একদিন আমি দার্জিলিঙে লাটসাহেরের বাড়ির কাছেই ঐ রাস্তাটায়

বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি রামলালবাবু হাসতে হাসতে আমার দিকে আসছেন, তাঁর সঙ্গে আবার এক সাহেব। রামলালবাবু বললেন, 'দুলিরাম! তোমার সেই ইংরাজি কবিতাটা একবার এঁকে শোনাতে হচ্ছে।



আমি এঁর কাছে তোমার সুখ্যাতি করছিলাম, তাই ইনি সেটা শুনবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন।' উনি নিজে থেকে বলছেন, তখন আমি আর কি করি? আমি সেই 'ক্যাসা-বিয়াঙ্কা' থেকে আবৃত্তি করলুম। তারপর দেখতে দেখতে যা ভিড় জমে গেল! সবাই শুনতে চায়, সবাই বলে, 'আবার কর।' মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম, নেহাত রামলাল-বাবু বললেন তাই আবার করতে হল।—এমন সময় কে যেন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'রামলালবাবু কে?' সকলে ফিরিয়া দেখি, একটি রোগা নিরীহগোছের পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক

সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সবজান্তা বলিল, 'রামলালবাবু কে, তাও জানেন না? লোহারপুরের জমিদার রামলাল রায়।' ভদ্রলোকটি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, তার নাম শুনেছি, সে তোমার কেউ হয় নাকি?' 'না, কেউ হয় না, এমনি খুব ভাব আছে আমার সঙ্গে। প্রায়ই চিঠিপত্র চলে।' ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, 'রামলালবাবু লোকটি কেমন?' সবজান্তা উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'চমৎকার লোক। যেমন চেহারা তেমনি কথাবার্তা, তেমনি কায়দা-দুরস্ত। এই আপনার চেয়ে প্রায় আধ হাত খানেক লম্বা হবেন, আর সেইরকম তাঁর তেজ! আমাকে তিনি কুস্তি শেখাবেন বলেছিলেন, আর কিছুদিন থাকলেই ওটা বেশ রীতিমতো শিখে আসতাম।' ভদ্রলোকটি বলিলেন, 'বল কি হে? তোমার বয়স কত?' 'আজ্ঞে এইবার তেরো পূর্ণ হবে।' 'বটে! বয়সের পক্ষে খুব চালাক তো! বেশ তো কথাবার্তা বলতে পার! কি নাম হে তোমার?' সবজান্তা বলিল, 'দুলিরাম ঘোষ। রণদাবাবু ডেপুটি আমার মামা হন।' শুনিয়া ভদ্রলোকটি ভারি খুশি হইয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। ছুটির পর আমরা সকলেই বাহির হইলাম। স্কুলের সম্মুখেই ডেপুটিবাবুর বাড়ি, তার বাহিরের বারান্দায় দেখি, সেই ভদ্রলোকটি বসিয়া দুলিরামের ডেপুটি-মামার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। দুলিরামকে দেখিয়াই মামা ডাক দিয়া বলিলেন, 'দুলি, এদিকে আয়, এঁকে প্রণাম কর—এটি আমার ভাগ্নে দুলিরাম।' ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, এর পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি।' দুলিরাম আমাদের দেখাইয়া খুব আড়ম্বর করিয়া ভদ্রলোকটিকে প্রণাম করিল। ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন, 'আমার পরিচয় জানো না বুঝি?' সবজান্তা এবার আর 'জানি' বলিতে পারিল না, আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। ভদ্রলোকটি তখন বেশ একটু মুচকি-মুচকি হাসিয়া আমাদের শুনাইয়া বলিলেন, 'আমার নাম রামলাল রায়, লোহারপুরের রামলাল রায়।' দুলিরাম খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখখানা লাল করিয়া হঠাৎ এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া ছেলেরা রাস্তার উপর হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল। তার পরের দিন আমরা স্কুলে আসিয়া দেখিলাম—সবজান্তা আসে নাই, তাহার নাকি মাথা ধরিয়াছে। নানা অজুহাতে সে দু-তিনদিন কামাই করিল, তারপর যেদিন স্কুলে আসিল, তখন তাহাকে দেখিবামাত্র তাহারই কয়েকজন চেলা, 'কিহে, রামলালবাবুর চিঠিপত্র পেলে?' বলিয়া তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর যতদিন সে স্কুলে ছিল, ততদিন তাহাকে খেপাইতে হইলে বেশি কিছু করা দরকার হইত না, একটিবার রামলালবাবর খবর জিজ্ঞাসা করিলেই বেশ তামাশা দেখা যাইত।

ভোলানাথের সর্দারি

সকল বিষয়েই সর্দারি করিতে যাওয়া ভোলানাথের ভারি একটা বদ অভ্যাস। যেখানে তাহার কিছু বলিবার দরকার নাই, সেখানে সে বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিতে যায়, যে কাজের সে কিছু-মাত্র বোঝে না সে কাজেও সে চটপট হাত লাগাইতে ছাড়ে না। এইজন্য গুরুজনেরা তাহাকে বলেন 'জ্যাঠা'— আর সমবয়সীরা বলে, 'ফড়-ফড়ি-রাম'! কিন্তু তাহাতে তাহার কোনো দুঃখ নাই, বিশেষ লজ্জাও নাই। সেদিন তাহার তিন ক্লাশ উপরের বড় বড় ছেলেরা যখন নিজেদের পড়াশুনা লইয়া আলোচনা করিতেছিল, তখন ভোলানাথ মুরুব্বির মতো গম্ভীর হইয়া বলিল, ওয়েবস্টারের ডিক্‌সনারি সবচাইতে ভালো। আমার বড়দা যে দু'ভলুম ওয়েবস্টারের ডিক্‌সনারি কিনেছেন, তার একখানা বই এত্তোখানি বড় আর এমনি মোটা। আর লাল চামড়া দিয়ে বাঁধানো।' উঁচু ক্লাশের একজন ছাত্র আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া বলিল, 'কি রকম লাল হে? তোমার এই কানের মতো?' কিন্তু তবু ভোলানাথ এমন বেহায়া, সে তার পরদিনই সেই তাহাদেরই কাছে ফুটবল সম্বন্ধে কি যেন মতামত দিতে গিয়া এক চড় খাইয়া আসিল।

বিশুদের একটা ইঁদুর ধরিবার কল ছিল। ভোলানাথ হঠাৎ একদিন 'এটা কিসের কল ভাই?' বলিয়া সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া কলকব্জা এমন বিগড়াইয়া দিল যে, কলটা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। বিশু বলিল, 'না জেনে-শুনে কেন টানাটানি করতে গেলি?' ভোলানাথ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, 'আমার দোষ হল বুঝি? দেখ তো হাতলটা কিরকম বিচ্ছিরি বানিয়েছে। ওটা আরও অনেক মজবুত করা উচিত ছিল। কলওয়ালা ভয়ানক ঠকিয়েছে।'

ভোলানাথ পড়াশুনায় যে খুব ভালো ছিল তাহা নয়, কিন্তু তবু, মাস্টার মহাশয় যখন কঠিন-কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন সে জানুক আর না-জানুক সাত তাড়াতাড়ি সকলের আগে জবাব দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। জবাবটা অনেক সময়েই বোকার মতো হইত, শুনিয়া মাস্টার মহাশয় ঠাট্টা করিতেন, ছেলেরা হাসিত; কিন্তু ভোলানাথের উৎসাহ তাহাতে কমিত না।

সেই যেবার ইস্কুলে বই চুরির হাঙ্গামা হয়, সেবারও সে এই রকম সর্দারি করিতে গিয়া

খুব জব্দ হয়। হেডমাস্টার মহাশয় ক্রমাগত বই চুরির নালিশে বিরক্ত হইয়া, একদিন প্রত্যেক ক্লাশে গিয়া জিগগেস করিলেন, 'কে চুরি করেছে তোমরা কেউ কিছু জানো ?'

ভোলানাথের ক্লাশে এই প্রশ্ন করিবামাত্র ভোলানাথ তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আমার বোধ হয় হরিদাস চুরি করে।' জবাব শুনিয়া আমরা সবাই অবাক হইয়া গেলাম। হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'কি করে জানলে যে হরিদাস চুরি করে ?' ভোলানাথ অম্লানবদনে বলিল, 'না, জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয়।' মাস্টার মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, 'জানো না, তবে অমন কথা বললে কেন ? ও রকম মনে করবার তোমার কি কারণ আছে ?' ভোলানাথ আবার বলিল, 'আমার মনে হচ্ছিল, বোধহয় ও নেয়—তাই তো বললাম। আর তো কিছু আমি বলিনি।' মাস্টার মহাশয় গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'যাও, হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাও।' তখনই তাহার কান ধরিয়া হরিদাসের কাছে ক্ষমা চাওয়ানো হইল। কিন্তু তবু কি তাহার চেতনা হয় ?' ভোলানাথ সাঁতার জানে না, কিন্তু তবু সে বাহাদুরি করিয়া হরিশের ভাইকে সাঁতার শিখাইতে গেল। রামবাবু হঠাৎ ঘাটে আসিয়া পড়েন, তাই রক্ষা। তা না হইলে দুজনকেই সেদিন ঘোষপুকুরে ডুবিয়া মরিতে হইত। কলিকাতায় মামার নিষেধ না শুনিয়া চল্‌তি ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া, ভোলানাথ কাদার উপর যে আছাড় খাইয়াছিল, তিন মাস পর্যন্ত তাহার আঁচড়ের দাগ তাহার নাকের উপর ছিল। আর বেদেরা শেয়াল ধরিবার জন্য যেবার ফাঁদ পাতিয়া রাখে, সেবার সেই ফাঁদ ঘাঁটিতে গিয়া ভোলানাথ কি রকম আটকা পড়িয়াছিল, সে কথা ভাবলে আজও আমাদের হাসি পায়। কিন্তু সব চাইতে যেবার সে জব্দ হইয়াছিল সেবারের কথা বলি শোনো।

আমাদের স্কুলে আসিতে হইলে কলেজবাড়ির পাশ দিয়া আসিতে হয়। সেখানে একটা ঘর আছে, তাহাকে বলে ল্যাবরেটরি। সেই ঘরে নানারকম অদ্ভুত কলকারখানা থাকিত। ভোলানাথের সবটাতেই বাড়াবাড়ি, সে এক দিন একেবারে কলেজের ভিতর গিয়া দেখিল, একটা কলের চাকা ঘুরানো হইতেছে, আর কলের একদিকে চড়াক্ চড়াক্ করিয়া বিদ্যুতের মতো ঝিলিক জ্বলিতেছে। দেখিয়া ভোলানাথের ভারি শখ হইল সেও একবার কল ঘুরাইয়া দেখে ! কিন্তু কলের কাছে যাওয়া মাত্র, কে একজন তাহাকে এমন ধমক দিয়া উঠিল যে, ভয়ে এক দৌড়ে সে ইস্কুলে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। কিন্তু কলটা একবার নাড়িয়া দেখিবার ইচ্ছা তাহার কিছুতেই গেল না। একদিন বিকালে যখন সকলে বাড়ি যাইতেছি, তখন ভোলানাথ যে কোন সময়ে কলেজবাড়িতে ঢুকিল তাহা আমরা বুঝতে পারি নাই। সে চুপিচুপি কলেজবাড়ির ল্যাবরেটরি বা যন্ত্রখানায় ঢুকিয়া, অনেকক্ষণ এদিক ওদিক

চাহিয়া দেখে, ঘরে কেউ নাই। তখনই ভরসা করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে কলকব্জা দেখিতে লাগিল। সেই দিনের সেই কলটা আলমারির আড়ালে উঁচু তাকের উপর তোলা রহিয়াছে, সেখানে তাহার হাত যায় না। অনেক কষ্টে সে টেবিলের পিছন হইতে একখানা বড় চৌকি লইয়া আসিল। এদিকে কখন যে কলেজের কর্মচারী চাবি দিয়া ঘরের তালা আঁটিয়া চলিয়া গেল, সেও ভোলানাথকে দেখে নাই, ভোলানাথেরও সে দিকে চোখ নাই। চৌকির উপর দাঁড়াইয়া ভোলানাথ দেখিল কলটার কাছে একটা অদ্ভুত বোতল। সেটা যে বিদ্যুতের বোতল, ভোলানাথ তাহা জানে না। সে বোতলটাকে ধরিয়া সরাইয়া রাখিতে গেল। অমনি বোতলের বিদ্যুৎ হঠাৎ তাহার শরীরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া গেল, মনে হইল যেন তাহার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কিসের একটা ধাক্কা লাগিল, সে মাথা ঘুরিয়া চৌকি হইতে পড়িয়া গেল। বিদ্যুতের ধাক্কা খাইয়া ভোলানাথ খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিল। তারপর ব্যস্ত হইয়া পালাইতে গিয়া দেখে দরজা বন্ধ! অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়া, কিল ঘুঁষি লাথি মারিয়াও





দরজা খুলিল না। জানালাগুলি অনেক উঁচুতে আর বাহির হইতে বন্ধ করা—চৌকিতে উঠিয়াও নাগাল পাওয়া গেল না। তাহার কপালে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে ভাবিল প্রাণপণে চিৎকার করা যাক, যদি কেউ শুনিতে পায়। কিন্তু তাহার গলার স্বর এমন বিকৃত শোনাইল, আর মস্ত ঘরটাতে এমন অদ্ভুত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল যে, নিজের আওয়াজে নিজেই সে ভয় পাইয়া গেল। ওদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কলেজের

বটগাছটির উপর হইতে একটা পেঁচা হঠাৎ 'ভূত-ভূতুম-ভূত' বলিয়া বিকট শব্দে ডাকিয়া উঠিল। সেই শব্দে একেবারে দাঁতে দাঁত লাগিয়া ভোলানাথ এক চীৎকারেই অজ্ঞান! কলেজের দরোয়ান তখন আমাদের ইস্কুলের পাঁড়েজি আর দু-চারটি দেশ-ভাইয়ের সঙ্গে জুটিয়া মহা উৎসাহে 'হাঁ হাঁ রে কাঁহা গয়ো রাম' বলিয়া ঢোল কর্তাল পিটাইতেছিল, তাহারা কোনোরূপ চীৎকার শুনিতে পায় নাই। রাতদুপুর পর্যন্ত তাহাদের কীর্তনের হল্লা চলিল, সুতরাং জ্ঞান হইবার পর ভোলানাথ যখন দরজায় দুমদুম লাথি মারিয়া চেঁচাইতেছিল, তখন সে শব্দ গানের ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের কানে একটু-আধটু আসিলেও তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। পাঁড়েজি একবার খালি বলিয়াছিল, কিসের শব্দ একবার খোঁজ লওয়া যাক, তখন অন্যেরা বাধা দিয়া বলিয়াছিল, 'আরে চিল্লানে দেও!' এমনি করিয়া রাত বারোটার সময় যখন তাহাদের উৎসাহ ঝিমাইয়া আসিল, তখন ভোলানাথের বাড়ির লোকেরা লন্ঠন হাতে হাজির হইল। তাহারা বাড়ি-বাড়ি ঘুরিয়া কোথাও তাহাকে আর খুঁজিতে বাকি রাখে নাই। দরোয়ানদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা একবাক্যে বলিল, 'ইস্কুল বাবুদের' কাহাকেও তাহারা দেখে নাই। এমন সময় সেই দুমদুম শব্দ আর চীৎকার আবার শোনা গেল।

তারপর ভোলানাথের সন্ধান পাইতে আর বেশি দেরি হইল না। কিন্তু তখনও উদ্ধার নাই—দরজা বন্ধ, চাবি গোপালবাবুর কাছে, গোপালবাবু বাসায় নাই, ভাইঝির বিবাহে গিয়েছেন, সোমবার আসিবেন। তখন অগত্যা মই আনাইয়া, জানালা খুলিয়া সার্সির কাঁচ ভাঙিয়া অনেক হাঙ্গামার পর, ভয়ে মৃতপ্রায় ভোলানাথকে বাহির করা হইল। সে ওখানে কি করিতেছিল, কেন আসিয়াছিল, কেমন করিয়া আটকা পড়িল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার বাবা প্রকাণ্ড এক চড় তুলিতেছিলেন, কিন্তু ভোলানাথের ফ্যাকাশে মুখখানা দেখিবার পর, সে চড় আর তাহার গালে নামে নাই।

নানাজনে জেরা করিয়া তাহার কাছে যে সমস্ত কথা আদায় করিয়াছেন, তাহা শুনিয়াই আমরা তাহার আটকা পড়িবার বর্ণনাটা দিলাম। সে কিন্তু আমাদের কাছে এত কথা কবুল করে নাই। আমাদের সে আরও উল্টা বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, সে ইচ্ছা করিয়াই বাহাদুরির জন্য কলেজবাড়িতে রাত কাটাইবার চেষ্টায় ছিল। যখন সে দেখিল যে, তাহার সে কথা কেহ বিশ্বাস করে না বরং আসল কথাটা ক্রমেই ফাঁস হইয়া পড়িতেছে, তখন সে এমন মুষড়াইয়া গেল যে, অন্তত মাস তিনেকের জন্য তাহার সর্দারির অভ্যাসটা বেশ একটু দমিয়া পড়িয়াছিল।

আশ্চর্য কবিতা

আমাদের ক্লাশে একটি নূতন ছাত্র আসিয়াছে। সে আসিয়া প্রথম দিনই সকলকে জানাইল, 'আমি পোইট্রি লিখতে পারি!'

একথা শুনিয়া ক্লাশের অনেকেই অবাক হইয়া গেল ; কেবল দুই-একজন হিংসা করিয়া বলিল, 'আমরাও ছেলেবেলায় ঢের-ঢের কবিতা লিখেছি!'

নূতন ছাত্রটি বোধহয় ভাবিয়াছিল, সে কবিতা লিখিতে পারে শুনিয়া ক্লাশে খুব হুলুস্থূল পড়িয়া যাইবে এবং কবিতার নমুনা শুনিবার জন্য সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিবে। যখন সেরূপ কিছুরই লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বেচারা, যেন আপন মনে কি কথা বলিতেছে, এরূপভাবে, যাত্রার মতো সুর করিয়া একটা কবিতা আওড়াইতে লাগিল—

ওহে বিহঙ্গম তুমি কিসের আশায়
বসিয়াছ উচ্চ ডালে সুন্দর বাসায়?
নীল নভোমণ্ডলেতে উড়িয়া উড়িয়া
কত সুখ পাও, আহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
যদ্যপি থাকিত মম পুচ্ছ এবং ডানা
উড়ে যেতাম তব সনে নাহি শুনে মানা—

কবিতা শেষ হইতে না হইতে, ভবেশ তাহার মতো সুর করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—

আহা, যদি থাক্‌ত তোমার
ল্যাজের উপর ডানা
উড়ে গেলেই আপদ যেত—
করত না কেউ মানা।

নূতন ছাত্র তাহাতে রাগিয়া বলিল, 'দেখ বাপু, নিজেরা যা পার না, তা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া ভারি সহজ। শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প শোনোনি বুঝি?' একজন ছেলে অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া বলিল, শৃগাল এবং দ্রাক্ষাফল! সে আবার কি গল্প?'

অমনি নূতন ছাত্রটি আবার সুর ধরিল—

বৃক্ষ হতে দ্রাক্ষাফল ভক্ষণ করিতে
লোভী শৃগাল প্রবেশিল এক দ্রাক্ষা ক্ষেতে
কিন্তু হায় দ্রাক্ষা যে অত্যন্ত উচ্চে থাকে
শৃগাল নাগাল পাবে কিরূপে তাহাকে,
বারম্বার চেষ্টায় হয়ে অকৃতকার্য
'দ্রাক্ষা টক' বলিয়া পালাল ছেড়ে রাজ্য।

সেই হইতে আমাদের হরেরাম একেবারে তাহার চেলা হইয়া গেল। হরেরামের কাছে আমরা শুনিলাম যে ছোকরার নাম শ্যামলাল। সে নাকি এত কবিতা লিখিয়াছে যে, একখানা আস্ত খাতা প্রায় ভরতি হইয়াছে আর আট দশটি কবিতা হইলেই তাহার একশোটা পূরো হয়; তখন সে নাকি বই ছাপাইবে।

ইহার মধ্যে একদিন এক কাণ্ড হইল। গোপাল বলিয়া একটি ছেলে স্কুল ছাড়িয়া যাইবে এই উপলক্ষে শ্যামলাল এক প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে 'বিদায়-বিদায়' বলিয়া অনেক 'অশ্রুজল' 'দুঃখশোক' ইত্যাদি কথা ছিল। গোপাল কবিতার আধখানা শুনিয়াই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, 'ফের যদি আমার নামে পোইট্রি লিখবি তো মারব এক থাপ্পড়।'

হরেরাম বলিল, 'আহা, বুঝলে না? তুমি স্কুল ছেড়ে যাচ্ছ কিনা, তাই ও লিখেছে।'

গোপাল বলিল, 'ছেড়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছি, তোর তাতে কিরে? ফের জ্যাঠামি করবি তো তোর কবিতার খাতা ছিঁড়ে দেব।'

দেখিতে দেখিতে শ্যামলালের কথা স্কুলময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহার দেখাদেখি আরও অনেকেই কবিতা লিখিতে শুরু করিল।

ক্রমে কবিতা লেখার বাতিকটা ভয়ানক রকম ছোঁয়াচে হইয়া, নিচের ক্লাশের প্রায় অর্ধেক ছেলেকে পাইয়া বসিল। ছোট-ছোট ছেলেদের পকেটে ছোট-ছোট কবিতার খাতা দেখা দিল। বড়দের মধ্যে কেহ কেহ শ্যামলালের চেয়েও ভালো কবিতা লিখিতে পারে বলিয়া শোনা যাইতে লাগিল। স্কুলের দেয়ালে, পড়ার কেতাবে, পরীক্ষার খাতায়, চারিদিকে কবিতা গজাইয়া উঠিল।

পাঁড়েজির বৃদ্ধ ছাগল যেদিন শিং নাড়িয়া দড়ি ছিঁড়িয়া স্কুলের উঠানে দাপাদাপি



করিয়াছিল, আর শ্যামলালকে তাড়া করিয়া খানায় ফেলিয়াছিল, তাহার পরদিন ভারতবর্ষের বড় ম্যাপের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা বাহির হইল—

পাঁড়েজির ছাগলের একহাত দাড়ি,
অপরূপ রূপ তার যাই বলিহারি !
উঠানে দাপটি করি নেচেছিল কাল
তারপর কি হইল জানে শ্যামলাল।

শ্যামলালের রঙটি কালো কিন্তু কবিতা পড়িয়া সে যথার্থই চটিয়া লাল হইল, এবং তখনি তাহার নিচে একটা কড়া জবাব লিখিতে লাগিল। সে সবেমাত্র লিখিয়াছে, 'রে অধম কাপুরুষ পাষণ্ড বর্বর—' এমন সময় গুরু-গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'ম্যাপের উপর কি লেখা হচ্ছে ?

ফিরে দেখে হেডমাস্টার মহাশয় !

শ্যামলাল একেবারে থতমত খাইয়া বলিল, 'আজ্ঞে স্যার, আগে ওরা লিখেছিল।'

'ওরা কারা ?'

শ্যামলাল বোকার মতো একবার আমাদের দিকে একবার কড়িকাঠের দিকে তাকাইতে লাগিল, কাহার নাম করিবে বুঝিতে পারিল না।

মাস্টার মহাশয় আবার বলিলেন, 'ওরা যদি পরের বাড়ি সিঁদ কাটতে যায়, তুমিও কাটবে ?'

যাহা হউক সেদিন অল্পের উপর দিয়াই গেল, শ্যামলাল একটু ধমক-ধামক খাইয়াই খালাস পাইল।

ইহার মধ্যে একদিন আমাদের পণ্ডিত মহাশয় গল্প করিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে যাহারা এক ক্লাশে পড়িত, তাহাদের মধ্যে একজন নাকি অতি সুন্দর কবিতা লিখিত। একবার ইন্‌স্পেকটার স্কুল দেখিতে আসিয়া, তাহার কবিতা শুনিয়া এমন খুশি হইয়াছিলেন যে, তাহাকে একটা সুন্দর ছবিওয়ালা বই উপহার দিয়াছিলেন।

ইহার মাসখানেক পরেই ইন্‌স্পেকটার স্কুল দেখিতে আসিলেন। প্রায় বিশ-পঁচিশটি ছেলে সাবধানে পকেটের মধ্যে লুকাইয়া কবিতার কাগজ আনিয়াছে। বড় হলের মধ্যে সমস্ত স্কুলের ছেলেদের দাঁড় করানো হইয়াছে, হেডমাস্টার মহাশয় ইন্‌স্পেকটারকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছেন—এমন সময় শ্যামলাল আস্তে আস্তে পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিল। আর যায় কোথায় ! পাছে শ্যামলাল আগেই তাহার কবিতা পড়িয়া ফেলে, এই ভয়ে ছোট-বড় একদল কবিতাওয়ালা একসঙ্গে নানাসুরে চীৎকার করিয়া, যে যার কবিতা হাঁকিয়া উঠিল। মনে হইল, সমস্ত বাড়িটা কর্তালের মতো ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, ইন্‌স্পেকটার মহাশয় মাথা ঘুরিয়া মাঝ পথেই মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন। ছাদের উপরে একটা বিড়াল ঘুমাইতেছিল, সেটা হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া তিনতলা হইতে পড়িয়া গেল, ইস্কুলের দরোয়ান হইতে অফিসের কেশিয়ার বাবু পর্যন্ত হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল !

সকলে সুস্থ হইলে পর মাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'এত চেঁচালে কেন?'

সকলে চুপ করিয়া রহিল।

আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, 'কে কে চেঁচিয়েছিল?'

পাঁচ-সাতটি ছেলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'শ্যামলাল।'

শ্যামলাল যে একা অত মারাত্মক রকম চেঁচাইতে পারে, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। যতগুলি ছেলের পকেটে কবিতার খাতা পাওয়া গেল, স্কুলের পর তাহাদের দেড়ঘন্টা আটকাইয়া রাখা হইল।

অনেক তম্বিতম্বার পর, একে একে সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িল। তখন হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'কবিতা লেখার রোগ হয়েছে? ও রোগের ওষুধ কি?'

বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'বিষস্য বিষমৌষধম্, বিষের ওষুধ বিষ। বসন্তের ওষুধ যেমন বসন্তের টিকা, কবিতার ওষুধ তস্য টিকা। তোমরা যে-যে কবিতা লিখেছ তার টিকা করে দিচ্ছি। তোমরা একমাস প্রতিদিন পঞ্চাশবার করে এটা লিখে এনে স্কুলে আমায় দেখাবে।' এই বলিয়া তিনি টিকা দিলেন—

পদে পদে মিল খুঁজে, গুণে দেখি চোদ্দ
এই দেখ লিখে দিনু কি ভীষণ পদ্য!
এক চোটে এইবারে উড়ে গেল সবি তা,
কবিতার গুঁতো মেরে গিলে ফেলি কবিতা।

একমাস তিনি কবিদের কাছে এই লেখা প্রতিদিন পঞ্চাশবার আদায় না করিয়া ছাড়িলেন না। এ কবিতার কী আশ্চর্য গুণ—তারপর হইতে কবিতা লেখার ফ্যাশান স্কুল হইতে একেবারেই উঠিয়া গেল।

নন্দলালের মন্দ কপাল

নন্দলালের ভারি রাগ, অঙ্কের পরীক্ষায় মাস্টার তাহাকে গোল্লা দিয়াছেন। সে যে খুব ভালো লিখিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু তা বলিয়া একেবারে গোল্লা দেওয়া কি উচিত ছিল? হাজার হোক সে একখানা পূরা খাতা লিখিয়াছিল তো! তার পরিশ্রমের কি কোনো মূল্য নাই? ঐ যে ত্রৈরাশিকের অঙ্কটা, সেটা তো তার প্রায় ঠিকই হইয়াছিল, কেবল একটুখানি হিসাবের ভুল হওয়াতে উত্তরটা ঠিক মেলে নাই। আর ঐ যে একটা ডেসিম্যাল্ অঙ্ক ছিল, সেটাতে গুণ করিতে গিয়া সে ভাগ করিয়া বসিয়াছিল, তাই বলিয়া কি একটা নম্বরও দিতে নাই? আরও অন্যায় এই যে, এই কথাটা মাস্টার মহাশয় ক্লাশের ছেলেদের কাছে ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছেন। কেন? আরেকবার হরিদাস যখন গোল্লা পাইয়াছিল, তখন তো সে কথাটা রাষ্ট্র হয় নাই!

সে যে ইতিহাসে একশোর মধ্যে পঁচিশ পাইয়াছে, সেটা বুঝি কিছু নয়? খালি অঙ্ক ভালো পারে নাই বলিয়াই তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে? সব বিষয়ে যে সকলকে ভালো পারিতে হইবে তাহারই বা অর্থ কি? স্বয়ং নেপোলিয়ান যে ছেলেবেলায় ব্যাকরণে একেবারে আনাড়ী ছিলেন, সে-বেলা কি? তাহার এই যুক্তিতে ছেলেরা দমিল না, এবং মাস্টারদের কাছে এই তর্কটা তোলাতে তাঁহারাও যে যুক্তিটাকে খুব চমৎকার ভাবিলেন, এমন তো বোধ হইল না। তখন নন্দলাল বলিল, তাহার কপালই মন্দ—সে নাকি বরাবর তাহা দেখিয়া আসিতেছে।

সেই তো যেবার ছুটির আগে তাহাদের পাড়ায় হাম দেখা দিয়াছিল, তখন বাড়িসুদ্ধ সকলেই হামে ভুগিয়া দিব্যি মজা করিয়া স্কুল কামাই করিল, কেবল বেচারা নন্দলালকেই নিয়মমতো প্রতিদিন স্কুলে হাজিরা দিতে হইয়াছিল। তারপর যেমন ছুটি আরম্ভ হইল, অমনি তাহাকে জ্বরে আর হামে ধরিল—ছুটির অর্ধেকটাই মাটি! সেই যেবার তাহার মামাতো ভাইয়েরা কেহ বাড়ি ছিল না—ছিলেন কোথাকার এক বদমেজাজি মেশো, তিনি উঠিতে-বসিতে কেবল ধমক আর শাসন ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। তাহার উপর সেবার এমন বৃষ্টি হইয়াছিল, একদিনও ভালো করিয়া খেলা জমিল না,

কোথাও বেড়ানো গেল না। সেই জন্য পরের বছর যখন আর সকলে মামার বাড়ি গেল তখন সে কিছুতেই যাইতে চাহিল না।

পরে শুনিল সেবার নাকি সেখানে চমৎকার মেলা বসিয়াছিল, কোনো রাজার দলের সঙ্গে পঁচিশটা হাতি আসিয়াছিল, আর বাজি যা পোড়ানো হইয়াছিল সে একেবারে আশ্চর্য রকম! নন্দলালের ছোট ভাই যখন বার বার উৎসাহ করিয়া তাহার কাছে এই সকলের বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন নন্দ তাহাকে এক চড় মারিয়া বলিল, 'যা যা! মেলা বক্‌বক্ করিসনে!'

তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল সেবার সে মামার বাড়ি গিয়াও ঠকিল, এবার না গিয়াও ঠকিল। তাহার মতো কপাল-মন্দ আর কেহ নাই।

স্কুলেও ঠিক তাই। সে অঙ্ক পারে না—অথচ অঙ্কের জন্য দুই-একটা প্রাইজ আছে—এদিকে ভূগোল-ইতিহাস তাহার কন্ঠস্থ, কিন্তু ঐ দুইটার একটাতেও প্রাইজ নাই। অবশ্য সংস্কৃতেও সে নেহাত কাঁচা নয়, ধাতুপ্রত্যয় বিভক্তি সব চটপট মুখস্থ করিয়া ফেলে—চেষ্টা করিলে কি পড়ার বই আর অর্থপুস্তকটাকে সড়গড় করিতে পারে না? ক্লাশের মধ্যে খুদিরাম একটু-আধটু সংস্কৃত জানে—কিন্তু তাহা তো বেশি নয়। নন্দলাল ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে হারাইতে পারে না?

নন্দ জেদ করিয়া স্থির করিল, 'একবার খুদিরামকে দেখে নেব। ছোকরা এ বছর সংস্কৃতের প্রাইজ পেয়ে ভারি দেমাক করছে—আবার অঙ্কের গোল্লার জন্য আমাকে খোঁটা দিতে এসেছিল। আচ্ছা এবার দেখা যাবে।'

নন্দলাল কাহাকেও না জানাইয়া সেইদিন হইতেই বাড়িতে ভয়ানকভাবে পড়িতে শুরু করিল। ভোরে উঠিয়াই সে 'হসতি হসতঃ হসন্তি' শুরু করে, রাত্রেও 'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরু' বলিয়া ঢুলিতে থাকে। কিন্তু ক্লাশের ছেলেরা এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানে না। পণ্ডিত মহাশয় যখন ক্লাশে প্রশ্ন করেন, তখন মাঝে মাঝে উত্তর জানিয়াও সে চুপ করিয়া মাথা চুলকাইতে থাকে, এমন কি কখনো ইচ্ছা করিয়া দু-একটা ভুল বলে, পাছে খুদিরাম তার পড়ার খবর টের পাইয়া আরও বেশি করিয়া পড়ায় মন দিতে থাকে! তাহার ভুল উত্তর শুনিয়া খুদিরাম মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, নন্দলাল তাহার কোনো জবাব দেয় না; কেবল খুদিরাম নিজে যখন এক-একটা ভুল করে, তখন সে মুচকি-মুচকি হাসে, আর ভাবে, 'পরীক্ষার সময় অমনি ভুল করলেই এবার ওঁকে সংস্কৃতের প্রাইজ পেতে হবে না।' ওদিকে ইতিহাসের ক্লাশে নন্দলালের প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। কারণ, ইতিহাস আর ভূগোল নাকি এক রকম শিখিলেই পাশ করা যায়—তাহার জন্য নন্দর কোনো ভাবনা নাই।

তাহার সমস্ত মনটা রহিয়াছে ঐ সংস্কৃত পড়ার উপরে—অর্থাৎ সংস্কৃত প্রাইজটার উপরে।

একদিন মাস্টার মহাশয় বলিলেন, 'কি হে নন্দলাল, আজকাল বুঝি বাড়িতে কিছু পড়াশুনা কর না? সব বিষয়েই যে তোমার এমন দুর্দশা হচ্ছে তার অর্থ কি?'

নন্দ আর একটু হইলেই বলিয়া ফেলিত, 'আজ্ঞে সংস্কৃত পড়ি।' কিন্তু কথাটাকে হঠাৎ সামলাইয়া 'আজ্ঞে সংস্কৃত—না সংস্কৃত নয়' বলিয়াই সে থতমত খাইয়া গেল।

খুদিরাম তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'কৈ! সংস্কৃতও তো কিছু পারে না।'

শুনিয়া ক্লাশসুদ্ধ ছেলে হাসিতে লাগিল। নন্দ একটু অপ্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—ভাগ্যিস্ তাহার সংস্কৃত পড়ার কথাটা ফাঁস হইয়া যায় নাই।

দেখিতে দেখিতে বছর কাটিয়া আসিল, পরীক্ষার সময় প্রায় উপস্থিত।

সকলে পড়ার কথা, পরীক্ষার কথা আর প্রাইজের কথা বলাবলি করিতেছে, এমন সময় একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হে নন্দ! এবার কোন্ প্রাইজটা নিচ্ছ?'

খুদিরাম নন্দর মতো গলা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আজ্ঞে সংস্কৃত—না সংস্কৃত নয়।'

সকলে হাসিল, নন্দও খুব উৎসাহ করিয়া সেই হাসিতে যোগ দিল। মনে ভাবিল, 'বাছাধন, এ হাসি আর তোমার মুখে বেশি দিন থাকছে না।'

যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হইল এবং যথাসময়ে শেষ হইল। পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য সকলে আগ্রহ করিয়া আছে, নন্দও রোজ নোটিশবোর্ডে গিয়া দেখে তাহার নামে সংস্কৃত প্রাইজ পাওয়ার কোনো বিজ্ঞাপন আছে কিনা।

তারপর একদিন হেডমাস্টার মহাশয় এক তাড়া কাগজ লইয়া ক্লাশে আসিলেন, আসিয়াই তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'এবার দু-একটা নতুন প্রাইজ হয়েছে আর অন্য-অন্য বিষয়েও কোনো-কোনো পরিবর্তন হয়েছে।'

এই বলিয়া তিনি পরীক্ষার ফলাফল পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে দেখা গেল, ইতিহাসের জন্য কে যেন একটা রূপার মেডেল দিয়াছেন। খুদিরাম ইতিহাসে প্রথম হইয়াছে, সে-ই ঐ মেডেলটা লইবে। সংস্কৃতে নন্দ প্রথম, খুদিরাম দ্বিতীয়—কিন্তু এবার সংস্কৃতে কোনো প্রাইজ নাই। হায় হায়! নন্দর অবস্থা তখন শোচনীয়! তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া গিয়া খুদিরামকে কয়েকটা ঘুঁষি লাগাইয়া দেয়। কে জানিত এবার ইতিহাসের জন্য প্রাইজ থাকিবে, আর সংস্কৃতের জন্য থাকিবে না। ইতিহাসের মেডেলটা তো সে অনায়াসেই পাইতে পারিত। কিন্তু তাহার মনের কষ্ট কেহ বুঝিল না—সবাই বলিল, 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে, কেমন করে ফাঁকি দিয়ে নম্বর পেয়েছে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া নন্দ বলিল, 'কপাল মন্দ!'

যতীনের জুতো

যতীনের নতুন জুতো কিনে এনে তার বাবা বললেন, 'এবার যদি অমন করে জুতো নষ্ট কর, তবে ওই ছেঁড়া জুতোই পরে থাকবে।' যতীনের চটি লাগে প্রতিমাসে একজোড়া। ধুতি তার দুদিন যেতে-না-যেতেই ছিঁড়ে যায়। কোন জিনিসে তার যত্ন নেই। বইগুলি সব মলাট ছেঁড়া, কোণ দুমড়ান, শ্লেটটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ফাটা। শ্লেটের পেনসিলগুলি সর্বদাই তার হাত থেকে পড়ে যায়, কাজেই ছোট-ছোট টুকরো-টুকরো। আরেকটা তার মন্দ অভ্যাস ছিল, লেডপেনসিলের গোড়া চিবানো। চিবিয়ে চিবিয়ে তার পেনসিলের কাঠটা বাদামের খোলার মতো খেয়ে গিয়েছিল। তাই দেখে ক্লাশের মাস্টার মশাই বলতেন, 'তুমি কি বাড়িতে ভাত খেতে পাও না?'

নতুন চটি পায়ে দিয়ে প্রথম দিন যতীন খুব সাবধানে রইল, পাছে ছিঁড়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে নামে, চৌকাঠ ডিঙোবার সময় সাবধানে থাকে, যাতে না ঠোক্কর খায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দুদিন পরে আবার যেই সেই। চটির মায়া ছেড়ে দুড়-দুড় করে সিঁড়ি নামা, যেতে-যেতে দশবার হোঁচট খাওয়া, সব আরম্ভ হল। কাজেই একমাস যেতে-না-যেতে চটির একটা পাশ একটু হাঁ করল।

মা বললেন, 'ওরে, এই বেলা মুচি ডেকে সেলাই করা, না হলে একেবারে যাবে।' কিন্তু মুচি ডাকা হয় না। চটির হাঁ-ও বেড়ে চলে। একটি জিনিসের যতীন খুব যত্ন করত। সেটি হচ্ছে তার ঘুড়ি। যে ঘুড়িটা তার মনে লাগত সেটিকে সে সযত্নে জোড়াতাড়া দিয়ে যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখত। খেলার সময়টা সে প্রায় ঘুড়ি উড়িয়ে কাটিয়ে দিত। এই ঘুড়ির জন্য কত সময় তাকে তাড়া খেতে হত। ঘুড়ি ছিঁড়ে গেলে সে রান্নাঘরে উৎপাত করত তার আঠা চাই বলে। ঘুড়ির লেজ লাগাতে, কিংবা সুতো কাটতে কাঁচি দরকার হলে সে মায়ের সেলাইয়ের বাক্স ঘেঁটে রেখে দিত। ঘুড়ি উড়াতে আরম্ভ করলে তার খাওয়াদাওয়া মনে থাকত না। সেদিন যতীন স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছে ভয়ে-ভয়ে। গাছে চড়তে গিয়ে তার নতুন কাপড়খানা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। বই রেখে চটি পায়ে দিতে গিয়ে দেখে, চটিটা এত ছিঁড়ে গেছে যে আর পরাই মুশকিল। কিন্তু সিঁড়ি নামবার সময় তার সে কথা মনে রইল না, সে দু-তিন সিঁড়ি ডিঙিয়ে নামতে লাগল। শেষকালে চটির হাঁ বেড়ে বেড়ে, সমস্ত দাঁত বের করে ভেঙচাতে লাগল! যেমনি সে শেষ তিনটা সিঁড়ি



ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়েছে, অমনি মাটিটা তার পায়ের নিচ থেকে সুড়ুৎ করে সরে গেল, আর ছেঁড়া চটি তাকে নিয়ে সাঁই-সাঁই করে শূন্যের উপর দিয়ে কোথায় যে ছুটে চলল তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে চটি যখন থামল, তখন যতীন দেখলো সে কোন অচেনা দেশে এসে পড়েছে। সেখানে চারিদিকে অনেক মুচি বসে আছে। তারা যতীনকে দেখে

কাছে এল, তারপর তার পা থেকে ছেঁড়া চটিজোড়া খুলে নিয়ে, সেগুলোকে যত্ন করে ঝাড়তে লাগল। তাদের মধ্যে একজন একটু মাতব্বর গোছের, সে যতীনকে বলল, 'তুমি দেখছি ভারি দুষ্টু। জুতোজোড়ার এমন দশা করেছ? দেখ দেখি, আর একটু হলে বেচারীদের প্রাণ বেরিয়ে যেত।' যতীনের ততক্ষণে একটু সাহস হয়েছে। সে বলল, 'জুতোর আবার প্রাণ থাকে নাকি?' মুচিরা বলল, 'তা না তো কি? তোমরা বুঝি মনে কর, তোমরা যখন জুতো পায়ে দিয়ে জোরে ছোট তখন ওদের লাগে না? খুব লাগে। লাগে বলেই তো ওরা মচ্‌মচ্‌ করে। যখন তুমি চটি পায়ে দিয়ে দুড়-দুড় করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেছিলে আর তোমার পায়ের চাপে ওর পাশ কেটে গিয়েছিল, তখন কি ওর লাগেনি? খুব লেগেছিল। সেই জন্যই ও তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। যত রাজ্যের ছেলেদের জিনিসপত্রের ভার আমাদের উপর। তারা সে সবের অযত্ন করলে আমরা তাদের শিক্ষা দিই।' মুচি যতীনের হাতে ছেঁড়া চটি দিয়ে বলল, 'নাও, সেলাই কর।' যতীন রেগে বলল, 'আমি জুতো সেলাই করি না, মুচিরা করে।' মুচি একটু হেসে বলল, 'একি তোমাদের দেশ পেয়েছ যে করব না বললেই হল? এই ছুঁচ-সুতো নাও, সেলাই কর।' যতীনের রাগ তখন কমে এসেছে, তার মনে ভয় হয়েছে। সে বলল, 'আমি জুতো সেলাই করতে জানি না।' মুচি বলল, 'আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেলাই তোমাকে করতেই হবে।' যতীন ভয়ে-ভয়ে জুতো সেলাই করতে বসল। তার হাতে ছুঁচ ফুটে গেল, ঘাড় নিচু করে থেকে-থেকে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল, অনেক কষ্টে সারাদিনে একপাটি চটি সেলাই হল। তখন সে মুচিকে বলল, 'কাল অন্যটা করব। এখন খিদে পেয়েছে।' মুচি বলল, 'সে কি! সব কাজ শেষ না করে তুমি খেতেও পাবে না, ঘুমোতেও পাবে না। একপাটি চটি এখনও বাকি আছে। তারপর তোমাকে আস্তে-আস্তে চলতে শিখতে হবে, যেন আর কোনো জুতোর উপর অত্যাচার না কর। তারপর দরজীর কাছে গিয়ে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে হবে। তারপর আর কি কি জিনিস নষ্ট কর দেখা যাবে।'

যতীনের তখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে কাঁদতে কাঁদতে কোনো রকমে অন্য চটিটা সেলাই করল। ভাগ্যে এ-পাটি বেশি ছেঁড়া ছিল না। তখন মুচিরা তাকে একটা পাঁচতলা উঁচু বাড়ির কাছে নিয়ে গেল। সে বাড়িতে সিঁড়ি বরাবর একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। তারা যতীনকে সিঁড়ির নিচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, 'যাও একেবারে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে যাও; আবার নেমে এস। দেখো, আস্তে-আস্তে একটি-একটি সিঁড়ি উঠবে নামবে।' যতীন পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গিয়ে নেমে এল। সে নিচে আসলে মুচিরা বলল, 'হয়নি। তুমি তিনবার দুটো সিঁড়ি একসঙ্গে উঠেছ, পাঁচবার লাফিয়েছ, দুবার তিনটে

করে সিঁড়ি ডিঙ্গিয়েছে। আবার ওঠ। মনে থাকে যেন, একটুও লাফাবে না, একটাও সিঁড়ি ডিঙোবে না।' এতটা সিঁড়ি উঠে নেমে যতীন বেচারীর পা টনটন করছিল। সে এবার আস্তে-আস্তে উপরে উঠল, আস্তে-আস্তে নেমে এল। তারা বলল, 'আচ্ছা, এবার মন্দ হয়নি। তাহলে চল দরজীর কাছে।' এই বলে তারা তাকে আর একটা মাঠে নিয়ে গেল, সেখানে খালি দরজীরা বসে সেলাই করছে। যতীনকে দেখেই তারা জিজ্ঞেস করল, 'কি? কি ছিঁড়েছ?' মুচিরা উত্তর দিল, 'নতুন ধুতিটা, দেখ কতটা ছিঁড়ে ফেলেছে।' দরজীরা মাথা নেড়ে বলল, 'বড় অন্যায়, বড় অন্যায়! শিগগির সেলাই কর।' যতীনের আর কথা বলবার সাহস হল না। সে ছুঁচ-সূতো নিয়ে ছেঁড়া কাপড় জুড়তে বসে গেল। সবে মাত্র দুফোঁড় দিয়েছে অমনি দরজীরা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওকে কি সেলাই বলে? খোল, খোল।' অমনি করে, বেচারী যতবার সেলাই করে, ততবার তারা বলে, 'খোল, খোল।' শেষে সে একেবারে কেঁদে ফেলে বলল, 'আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, বড্ড খিদে পেয়েছে। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও, আমি আর কখনও কাপড় ছিঁড়ব না, ছাতা ছিঁড়ব না।' তাতে দরজীরা হাসতে-হাসতে বলল, 'খিদে পেয়েছে? তা তোমার খাবার জিনিস তো আমাদের কাছে ঢের আছে,' এই বলে তারা তাদের কাপড়ের দাগ দেবার পেনসিল কতগুলো এনে দিল।

'তুমি তো পেনসিল চিবোতে ভালোবাস, এইগুলি চিবিয়ে খাও, আর কিছু আমাদের কাছে নেই।' এই বলে তারা যার যার কাজে চলে গেল। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে যতীন কাঁদতে-কাঁদতে মাটিতে শুয়ে পড়ল। এমন সময় আকাশে বোঁ-বোঁ করে কিসের শব্দ হল, আর যতীনের তালি দেওয়া সাধের ঘুড়িটা গোঁৎ খেয়ে এসে তার কোলের উপর পড়ল। ঘুড়ি ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'তুমি আমাকে যত্ন করেছ, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। শিগগির আমার লেজটা ধর।' যতীন তাড়াতাড়ি ঘুড়ির লেজ ধরল। ঘুড়িটা অমনি তাকে নিয়ে সোঁ করে আকাশে উঠে গেল। সেই শব্দ শুনে দরজীরা বড় বড় কাঁচি নিয়ে ছুটে এল ঘুড়ির সুতোটা কেটে দিতে। হঠাৎ ঘুড়ি আর যতীন জড়াজড়ি করে নিচের দিকে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে যেই মাটিটা ধাঁই করে যতীনের মাথায় লাগল, অমনি সে চমকে উঠল। ঘুড়িটা কি হল কে জানে! যতীন দেখল সে সিঁড়ির নিচে শুয়ে আছে, আর তার মাথায় ভয়ানক বেদনা হয়েছে। কিছুদিন ভুগে যতীন সেরে উঠল। তার মা বলতেন, 'আহা, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে এই ভোগানিতে বাছা আমার বড় দুর্বল হয়ে গেছে। সে স্ফূর্তি নেই, সে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে চলা নেই, কিছুই নেই। তা নইলে এক জোড়া জুতো চার মাস যায়?'

আসল কথা যতীন এখনও সেই মুচিদের আর দরজীদের কথা ভুলতে পারেনি।

নতুন পণ্ডিত

আগে যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তিনি লোক বড় ভালো। মাঝে মাঝে আমাদের যে ধমক-ধামক না করিতেন, তাহা নয়, কিন্তু কখনও কাহাকেও অন্যায় শাস্তি দেন নাই। এমন কি ক্লাশে আমরা কত সময় গোল করিতাম তিনি মাঝে মাঝে 'আঃ' বলিয়া ধমক দিতেন। তাঁর হাতে একটা ছড়ি থাকিত, খুব বেশি রাগ করিলেই সেই ছড়িটাকে টেবিলের উপর আছড়াইতেন—সেটাকে কোনো দিন কাহারও পিঠে পড়িতে দেখি নাই! তাই আমরা কেউ তাঁহাকে মানিতাম না।

আমাদের হেডমাস্টার মশাইটি দেখিতে তাঁর চাইতেও নিরীহ ভালোমানুষ! ছোট্ট বেঁটে মানুষটি, গোঁফ দাড়ি কামানো, গোলগাল মুখ, তাহাতে সর্বদাই যেন হাসি লাগিয়াই আছে। কিন্তু চেহারায় কি হয়? তিনি যদি 'শ্যামচরণ কার নাম?' বলিয়া ক্লাশে আসিয়াই আমায় ডাক দিতেন, তবে তাঁর গলার আওয়াজেই আমার হাত-পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইত। তাঁর হাতে কোনো দিন বেত দেখি নাই, কারণ বেতের কোনো দরকার হইত না—তাঁর হুঙ্কারটি যার উপর পড়িত সেই চক্ষে অন্ধকার দেখিত।

একদিন পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, 'সোমবার থেকে আমি আর পড়াতে আসব না—কিছু দিনের ছুটি নিয়েছি। আমার জায়গায় আর একজন আসবেন। দেখিস, তাঁর ক্লাশে তোরা যেন গোল করিসনে।' শুনিয়া আমাদের ভারি উৎসাহ লাগিল; তারপর যে কয়দিন পণ্ডিতমহাশয় স্কুলে ছিলেন, আমরা ক্লাশে এক মিনিটও পড়ি নাই। একদিন বেহারীলাল পড়ার সময় পড়িয়াছিল, সেজন্য আমরা পরে চাঁদা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক, পণ্ডিতমহাশয় সোমবার আর আসিলেন না—তাঁহার বদলে যিনি আসিলেন, তাঁহার গোল কালো চশমা, মুখভরা গোঁফের জঙ্গল আর বাঘের মতো আওয়াজ শুনিয়া আমাদের উৎসাহ দমিয়া গেল। তিনি ক্লাশে আসিয়াই বলিলেন, 'পড়ার সময় কথা বলবে না, হাসবে না, যা বলব তাই করবে। রোজকার পড়া রোজ করবে। আর যদি তা না কর, তা হলে তুলে আছাড় দেব।' শুনিয়া আমাদের তো চক্ষু স্থির!

ফকিরচাঁদের তখন অসুখ ছিল, সে বেচারা কদিন পরে ক্লাশে আসিতেই, নূতন পণ্ডিত-মহাশয় তাহাকে পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। ফকির থতমত খাইয়া ভয়ে আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে—আমি ইস্কুলে আসিনি—' পণ্ডিতমহাশয় রাগিয়া বলিলেন,

ইস্কুলে আসনি তো কোথায় এসেছ? তোমার মামার বাড়ি?' বেচারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, 'সাতদিন ইস্কুলে আসিনি, কি করে পড়া বলব?' পণ্ডিতমহাশয় 'চোপরাও বেয়াদব—মুখের উপর মুখ' বলিয়া এমন ভয়ানক গর্জন করিয়া উঠিলেন যে ভয়ে ক্লাশসুদ্ধ ছেলের মুখের তালু শুকাইয়া গেল। আমাদের হরিপ্রসন্ন অতি ভালো ছেলে। সে একদিন স্কুলের অফিসে গিয়া খবর পাইল—সে নাকি এবার কি একটা প্রাইজ পাইবে। খবরটা শুনিয়া বেচারা ভারি খুশি হইয়া ক্লাশে আসিতেছিল, এমন সময় নূতন পণ্ডিত-মহাশয় 'হাসছ কেন' বলিয়া হঠাৎ এমন ধমক দিয়া উঠিলেন যে মুখের হাসি এক মুহূর্তে আকাশে উড়িয়া গেল। তাহার পরদিন আমাদের ক্লাশের বাহিরে রাস্তার ধারে, কে যেন হো-হো করিয়া হাসিতেছিল, শুনিয়া পণ্ডিতমহাশয় পাশের ঘর হইতে হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া আর কথাবার্তা নাই, 'কেবল হাসি?' বলিয়া হরিপ্রসন্নর গালে ঠাস্-ঠাস্ করিয়া কয়েক চড় লাগাইয়া, আবার হন্-হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি হরি-প্রসন্নর উপর তিনি বিনা কারণে যখন-তখন খাপ্পা হইয়া উঠিতেন। দেখিতে দেখিতে স্কুল-সুদ্ধ ছেলে নূতন পণ্ডিতের উপর হাড়ে চটিয়া গেল। একদিন আমাদের অঙ্কের মাস্টার আসেন নাই, হেডমাস্টার রামবাবু বলিয়া গেলেন, 'তোমরা ক্লাশে বসিয়া পুরাতন পড়া পড়িতে থাক।'—আমরা পড়িতে লাগিলাম, কিন্তু খানিক বাদেই পণ্ডিতমহাশয় পাশের ঘর হইতে 'পড়ছ না কেন?' বলিয়া টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুঁষি মারিলেন। আমরা বলিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়ছি তো।' তিনি আবার বলিলেন, 'তবে শুনতে পাচ্ছি না কেন, চেঁচিয়ে পড়।'

যেই বলা অমনি বোকা ফকিরচাঁদ

'অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—'

বলিয়া এমন চেঁচাইয়া উঠিল যে, পণ্ডিতমহাশয়ের চোখ হইতে চশমাটা পড়িয়া গেল। মাস্টার মহাশয় গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন, তারপর কেন জানি না হরিপ্রসন্নর কানে ধরিয়া তাহাকে সমস্ত স্কুল ঘুরাইয়া আনিলেন, তাহাকে তিনদিন ক্লাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হুকুম দিলেন, একটাকা জরিমানা করিলেন, তাহার কালো কোটের পিঠে খড়ি দিয়া 'বাঁদর' লিখিয়া দিলেন, আর স্কল হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়া রাখিলেন। পরদিন রামবাবু হরিপ্রসন্নকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং তাহার কাছে সমস্ত কথা শুনিয়া আমাদের ক্লাশে খোঁজ করিতে আসিলেন। তখন ফকিরচাঁদ বলিল, 'আজ্ঞে, হরে চেঁচায়নি,



আমি চেঁচিয়েছি।' রামবাবু বলিলেন, 'পণ্ডিতমশাইকে পাতকী বলিয়া কি গালাগালি করিয়াছিলে ?'—ফকির বলিল, 'পণ্ডিতমশাইকে কিছুই বলিনি, আমি পড়ছিলাম—

অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—'

এই সময় নূতন পণ্ডিতমহাশয় ক্লাশের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বোধ হয় শেষ কথাটুকু শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন তাঁহাকে লইয়া কিছু একটা ঠাট্টা করা হইতেছে। তিনি রাগে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া হাঁ-হাঁ করিয়া ক্লাশের মধ্যে আসিয়া রামবাবুর কালো কোট দেখিয়াই 'তবে রে হরিপ্রসন্ন' বলিয়া হেডমাস্টার মহাশয়কে পিটাইতে লাগিলেন। আমরা ভয়ে কাঠ হইয়া রহিলাম। হেডমাস্টার মহাশয় অনেক কষ্টে পণ্ডিতের হাত ছাড়াইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন যদি পণ্ডিতের মুখ দেখিতে! বেচারা ভয়ে একেবারে জুজু! তিন-চারবার হাঁ করিয়া আবার মুখ বুজিলেন, তারপর এদিক-ওদিক চাহিয়া একদৌড়ে সেই যে স্কুল হইতে পালাইয়া গেলেন, আর কোনোদিন তাঁহাকে স্কুলে আসিতে দেখি নাই।

দুইদিন পরে পুরাতন পণ্ডিতমহাশয় আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমাদের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল, আমরা তো হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলামই, এমন কি সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর তাঁহার ক্লাশে গোলমাল করিব না, যতই পড়া দিন-না-কেন, খুব ভালো করিয়া পড়িব।





সুকুমার মানে নির্মল শিশু আর
রায় মানে রাজা
কিন্তু সুকুমার রায় শুধু
শিশুর রাজা নন, শিশু সাহিত্যেরও
তাই সর্বকালে সর্বযুগে
শিশু সাহিত্যের তালিকার
সবার উপরে

সুকুমার রায়

শিশু সাহিত্যের রাজা সুকুমার রায়ের
হাসি খুশির বই
পেয়ে আর দিয়ে সমান মজা
সুকুমার রায়ের বই
হাতে আনা মানে এক জাহাজ
সোনা নিয়ে ঘরে ফেরা